দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ এবং শাসকদলের হিন্দুবিদ্বেষী চক্রান্ত— পৃঃ ২৪

ইউনুসকে সামনে রেখে জঙ্গিদের ক্ষমতা দখলের ছক তৈরি হয়— পৃঃ ৩৬

৭৭ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ২১ জুলাই, ২০২৫।। ৪ শ্রাবণ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

দুই বঙ্গে সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২১ জুলাই - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

হাজার ভূতের রাজার দয়ায় বাম-তৃণমূলের উদয় : ভূতের রাজা দিল বর ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দিদির প্রেম শুধুই মুখে মুখে ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

আত্মনির্ভর ভারত কি পশ্চিমি বিশ্ব তথা চীনের পক্ষে বিপদসংকেত? ☐ পঙ্কজ জগন্নাথ জয়সওয়াল ☐ ৮

সন্ন্যাসীর অপমান— সইবে না হিন্দুস্থান ☐ কৌটিল্য ☐ ১০

পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজকে মাদকাসক্তিতে বুঁদ করে রাখতে চায় রাজ্যের শাসক দল ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১১

হিন্দু সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত : তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ ☐ পিনাকপাণি ঘোষ ☐ ১৩

অবিলম্বে ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন-কানুনের সংস্কার প্রয়োজন ☐ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ☐ ১৫

হিন্দুশূন্য হলে বাংলাদেশ অচিরেই সোশ্যাল ক্যাপিটাল শূন্য দেশে পরিণত হবে ☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ১৭

সেকুলারিজমের ঘোর কাটতে চলেছে ☐ নারায়ণ শঙ্কর দাস ☐ ২০

সাধু সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত : অবসান হোক রাক্ষসরাজের ☐ সুপ্রতিম চক্রবর্তী ☐ ২৩

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ এবং শাসকদলের হিন্দুদ্বেষী চক্রান্ত ☐ ড. বিনয়ভূষণ দাশ ☐ ২৪

ত্রিপুরার সামাজিক মিলনমেলা : খার্চি পূজা ☐ অপু সাহা ☐ ৩১

ভারতমাতা ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা ☐ ধর্মানন্দ দেব ☐ ৩২

বহুমুখী প্রতিভায় ভরপুর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ☐ প্রদীপ মারিক ☐ ৩৪

ইউনুসকে সামনে রেখে জঙ্গিদের ক্ষমতা দখলের ছক তৈরি হয় ☐ ৩৬

ভুলে যাওয়া এক ইতিহাস ভোলানাথ সেনের 'প্রাচীন কাহিনি' ☐ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ☐ ৩৮

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বর্তমান ভারতবর্ষ : আদর্শ ও বাস্তব প্রেক্ষাপট ☐ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ☐ ৪৩

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে সংবিধান-সহ সংস্কার কার্যক্রম শেষ হতে চলেছে ☐ ৪৫

বর্তমান ভারত এবং সাভারকর ☐ ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৭

ভারতের মুসলমানদের উপর আরবীয় প্রভাব তাদের অনুন্নত রেখেছে ☐ অমলেশ মিশ্র ☐ ৪৮

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী না প্রকৃত নাগরিক : কাদের হাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ? ☐ বিপ্লব বিকাশ ☐

গল্পকথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **চিঠিপত্র : ১৯** ☐ **অঙ্গনা : ২১** ☐ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ☐ **সমাবেশ সমাচার : ২৭-২৯** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ☐

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৮ জুলাই
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৮ জুলাই
২০২৫

পক্ষপাতদুষ্ট ওবিসি সংরক্ষণ

গতবছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল ঘোষণা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ১৯৯৭ সালে মোট ওবিসি সংরক্ষণ ছিল ৭ শতাংশ। বর্তমানে ওবিসি-এ ও বি দুটি শ্রেণী মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি সংরক্ষণ দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশে। হাইকোর্টের রায় সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে মুসলমানদের ৬৭টি এবং অ-মুসলমানদের মাত্র ৯টি সম্প্রদায়কে ওবিসি হিসেবে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। ফলে ফের রাজ্যের ওবিসি সংরক্ষণ হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ মুসলমান সম্প্রদায়ভিত্তিক। ভোটব্যাংকের রাজনীতির দরুন গরিব ও অনগ্রসর হিন্দু সমাজের কাছে অধরা থাকছে উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরির সুযোগ।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়টি আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাক্ষস শাসনের অবসান অনিবার্য

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ভূমি। এই দেশ ব্রহ্মকে সত্য জ্ঞান করিয়াছে, জগৎকেও সত্য বলিয়া মানিয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দুইদিকেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই জ্ঞানের সন্ধান দিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞ মুনি ঋষিগণ। এই মুনি ঋষিদেরই একটি ধারা হইল সর্বত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীগণ। তাঁহারা নিজের মুক্তি কামনা করিয়াছেন জগতের হিতার্থে। বিত্ত হইতে চিত্ত শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষা তাঁহারাই মানুষকে দিয়াছেন। তাই এই দেশ সাধু সন্ন্যাসীদের শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে। সাধু সন্ন্যাসী রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে রাজা মহারাজা পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া সাধু সন্ন্যাসীর চরণ বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার আশীর্বাদ কামনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রজাকল্যাণকামী নরপতিগণের পথপ্রদর্শক ছিলেন এই সন্ন্যাসীগণই। তাঁহারা রাজগুরু রূপে বন্দিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শনে এক-একটি রাজ্য হইয়াছিল সমৃদ্ধিশালী। এই সন্ন্যাসীদিগকে বড়ো ভয় করিত দানব, অসুর ও রাক্ষসেরা। লোকহিতার্থে সাধুদিগের যজ্ঞকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করিত তাহারা। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদিতে ইহার ভুরি ভুরি উল্লেখ রহিয়াছে। সাধুদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে রাক্ষস ও অসুরদের সহিত। বর্তমান সময়েও ইহারা রহিয়াছে। সন্ন্যাসীদিগকে বড়ো ভয় পাইয়া থাকে ইহারা। বহিঃশত্রুর আক্রমণে অথবা অযোগ্য শাসকের কারণে দেশ, জাতি, সমাজ ও ধর্ম যখন বিপন্ন হইয়াছে, তখন এই সন্ন্যাসীরাই সমাজের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি নির্মাণ করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য চাণক্য, স্বামী বিদ্যারণ্য, সমর্থ স্বামী রামদাস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাই সর্বযুগে সর্বকালেই রাক্ষসপ্রবৃত্তির মানুষ অথবা শাসকের বড়ো ভয় সাধু সন্ন্যাসীদিগকে।। স্বাধীনোত্তর ভারতেও দেশের শাসককে রাক্ষসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসীদিগের উপর আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। ১৯৬৬ সালে গোহত্যা নিবারণার্থে আইন প্রণয়নের দাবিতে দশলক্ষাধিক সাধু সন্ন্যাসী নূতন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নিকট জমায়েত হইলে পাঁচহাজার সন্ন্যাসীকে গুলি চালাইয়া হত্যা করিয়াছে স্বাধীন ভারতের পুলিশ প্রশাসন। গুজরাট ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকায় জনজাতিদের সেবা, শিক্ষা, স্বাবলম্বন ও সংস্কারের দীপ যিনি প্রজ্বলন করিবার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন সেই সন্ন্যাসী স্বামী অসীমানন্দ মহারাজকে কংগ্রেস প্রশাসন কারাগারে রাখিয়া বহু বৎসর অকথ্য নির্যাতন করিয়াছে। সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর নাম্নী এক সন্ন্যাসিনীকেও একইভাবে কারাগারে রাখিয়া নির্যাতন করিয়া শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট শাসক তো প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার রাজপথে আনন্দমার্গের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে। ওড়িশায় জনজাতি সমাজের সেবায় রত স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী এবং তাঁহার চারজন শিষ্যকে ২০০৮ সালের ২৩ আগস্ট বিদেশি মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। ২০২০ সালে মহারাষ্ট্রের পালঘরে হিন্দু বিরোধী রাজ্য সরকারের পুলিশের সম্মুখেই দুইজন সন্ন্যাসীকে দুষ্কৃতীরা হত্যা করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকে মানবসেবার ব্রত হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই তথাকথিত রাক্ষসেরা। বরং যাহারা সন্ন্যাসীদিগকে হত্যা করিয়াছে, নির্যাতন করিয়াছে, তাহারাই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিতেও বহু বৎসর হইতেই রাক্ষসরাজ চলিতেছে। এই রাজ্যেও শাসক দলের পক্ষ হইতে অথবা পরিষ্কার করিয়া বলিলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে একজন সন্ন্যাসীর চরিত্রে কালিমা লেপনের চক্রান্ত শুরু হইয়াছে। সেই সন্ন্যাসীর অপরাধ যে তিনি হিন্দুদের হইয়া কথা বলেন, হিন্দুদের বিপদে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়া থাকেন। এই রাজ্যে বিশেষ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় শাসক দলের মদতপুষ্ট জেহাদিদের আক্রমণে বিপন্ন হিন্দুদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই নৈরাজ্যের অবসানের নিমিত্ত হিন্দুদিগকে সংগঠিত হইবার কথা বলেন। তাই সেই তেজদীপ্ত সন্ন্যাসীর কণ্ঠ স্তব্ধ করিবার জন্য তাঁহার চরিত্রে কালিমা লেপন করা হইতেছে। এই কথা সত্য যে, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের ন্যায় সন্ন্যাসীর চরিত্রে কালিমা লেপন করিয়া এই রাজ্যের হিন্দু শক্তিকে অবদমিত করা যাইবে না। হিন্দু সমাজ সন্ন্যাসীর প্রতি এই অপমান সহ্য করিবে না। ইতিহাস সাক্ষী, সাধু সন্ন্যাসীর উপর যাহারা আক্রমণ করিয়াছে তাহারা সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। সন্ন্যাসীর প্রতি অপমান এই রাক্ষস শাসনের পতনকে ত্বরান্বিত করিবে তাহার সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে।

সুভাষিতম্

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।। (শ্রীগীতা ১৬।৭)

আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি— দুটিকেই জানে না। তাই তাদের বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি নেই, সদাচার নেই এবং সত্যভাষণও নেই।

হাজার ভূতের রাজার দয়ায় বাম-তৃণমূলের উদয়

ভূতের রাজা দিল বর

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে বেল পাকলে কাকের কী? কাকের অনেক কিছু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। সিঁদুরের মেঘ দেখছেন। বিহার নির্বাচনে বিশেষ ধরনের ভোটার তালিকা সংশোধন করছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। তাতেই বিপত্তি। এ রাজ্যে তা চালু হলে কয়েক কোটি ভুয়ো ভোটার বাদ পড়বে। সর্বশক্তি দিয়ে তা আড়াল করতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম আদালতের চড় খেয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। লেজুড় কংগ্রেস দাবি করেছে কমিশনের অধিকার খর্ব নয়, স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনের সময় কোনো ন্যায্য ভোটার যাতে তালিকা থেকে বাদ না পড়ে, আদালতে সেই আবেদন তারা জানিয়েছিল। দলের এক নির্লজ্জ ও বেহায়া সাংসদকে দিয়ে আদালতে এই রিভিশনের বিরোধিতা করিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের সঙ্গে অবান্তর প্রশ্নের সম্পর্ক তৈরি করতে মাঠে নেমেছে বালকবুদ্ধি রাহুল গান্ধী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন যে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করা যায় না। এ বিষয়ে ভারতীয় সংবিধান কমিশনকে বিশেষ সুরক্ষা বা 'ইমিউনিটি' দিয়েছে। তাই এ নিয়ে জলঘোলা করা ভিত্তিহীন। 'নির্বাচন কমিশন' গঠনের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের অদলবদলে জলঘোলা হয়েছে, কিন্তু তার কাজের আওতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অর্বাচীন ব্যবহার।

নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ভোটে হেরে কলকাতা হাইকোর্টে ভোট জালিয়াতির মামলা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যদিও জানতেন তাতে কোনো লাভ নেই। নন্দীগ্রাম থেকে পালিয়ে নিজের গড় ভবানীপুরে আসেন, যদিও ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬টি হেরে যান। ৩টি মুসলমান-অধ্যুষিত ওয়ার্ড থেকে জেতার ভোট তুলে নেন। ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতা করছেন। এ রাজ্যের অধিকাংশ ভুয়ো ভোটার অনুপ্রবেশকারী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের। তার সঙ্গে মিশেছে অন্যান্য রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক। এদের ভোটেই বামেরা জিতত। এখন তৃণমূল জেতে। ভোটবাজারে এরাই সেই ভূতের রাজা যাদের বরে এতদিন ধরে বিদেশি বাম আর তৃণমূল জিতে চলেছে। 'নকলি' বা ভুতুড়ে ভোট কীভাবে আসে তা ধরতেই যেমন বিহারে জাল পেতেছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্যমন্ত্রী মমতার আশঙ্কা এখানেও সে জাল পাতা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে মুসলমানরা ভোট দিয়ে জেতায়, মমতা তাদের গোরু (দুধেল গাই) ইত্যাদি বলে থাকেন। দেনাপাওনার খেলায় তারাও মুখ বুজে থাকে।

আশির দশক থেকেই ব্যাকডোর রাজনীতি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই সব ঘটনাতেই পিছনের রাস্তা খোঁজেন। এখন অবান্তর ভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর সম্পর্ক জুড়েছেন। 'এনআরসি জুজু' দেখিয়ে মুসলমান ভোট নিজের কাছে রাখতে তিনি মরিয়া। রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তাদের কানে নতুন কথা ঢোকানোর চেষ্টা করছেন বটে, তবে মনে হয় না 'সে বধির কভু জাগিবে এ অন্তরে'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ'। রাজ্যকে অপশাসনমুক্ত করার লক্ষ্যে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর পক্ষ থেকে সবরকম প্রয়াস জারি রেখেছেন। বিজেপি হিন্দু ভোটেই জিতবে। জাতীয় স্তরে বিরোধী দলগুলির ভাবনায় এতোটাই দৈন্য যে, তারা বোঝেন না সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন যে ব্যবস্থা নেয় সেটাই শিরোধার্য। যে কোনো তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআই-এর যেমন কোনো বিকল্প নেই, নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রেও তাই। ভারতীয় গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাঠামোর মধ্যে থেকেই তার বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সরকার নির্বাচন কমিশনকে নিজের মতো করে ব্যবহারের চেষ্টা করে গিয়েছে। জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতের ইতিহাসের 'কলঙ্কিত নেত্রী'র উদাহরণ হিসেবে থেকে গিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী। যেমন ১৯১৯-এ ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা জালিয়ানওয়ালাবাগ নরহত্যা। চরম খারাপকে আজও ইন্দিরার 'জরুরি অবস্থা' আর 'জালিয়ানওয়ালাবাগের নরহত্যা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম হেরে যায়। কিন্তু ২০০৬-এ তার ঠিক আগের ভোটে তারা সর্বোচ্চ আসন পায়। কেন্দ্রীয় সরকারকে তা ভাবিয়েছিল। ২০১১-তে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের ফয়দা তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএমের ভুয়ো ভোটার, চট-ভূত (সিপিএম ক্যাডাররা বুথে ঢুকে চটের আড়াল থেকে নজর রাখত কে কাকে ভোট দিচ্ছে) আর মৃত ভোটারদের সেযাত্রায় ছেঁটে দেয় নির্বাচন কমিশন। মুখ থুবড়ে পড়ে সিপিএম। ২৩৫ থেকে বিদেশি বামেরা ৬০-এ নেমে আসে, যার মধ্যে সিপিএমের আসন সংখ্যা ছিল ৪০। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছেন 'বিহারের নির্বাচনী মডেল' এখানে চালু হলে ভুয়ো ভোটার নিয়ে তার 'ভূতের রাজা'র খেলাও ফুরিয়ে যাবে। সিপিএমের দশা হবে। তাই দল বেঁধে ভূতের রাজার বরের আশায় আদালতে গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি। আপাতত সে গুড়ে বালি পড়েছে। বাকিটুকুর জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদির প্রেম শুধুই মুখে মুখে

কন্যাশ্রীপ্রেমীষু দিদি,

প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এই চিঠি। কেন ক্ষমা চাইলাম জানেন? কারণ, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আপনার সব ভালোবাসাই বকধার্মিকের মতো। মুখের কথায় ভালোবাসা। ঠিক যেমন কন্যাশ্রী নামে ডেকে প্রেম দেখালেও আপনি আদৌ রাজ্যের কিশোরীদের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে পারেননি।

দিদি, সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে নাবালিকার মৃত্যুর লজ্জা থেকে যেন মুক্তি নেই রাজ্যবাসীর। উন্নয়নের যত প্রমাণ পেশ করছে রাজ্য সরকার, তার বিপরীতে সাক্ষ্য দিচ্ছে নাবালিকা বিবাহ, নাবালিকার গর্ভধারণ এবং প্রসূতিমৃত্যুর পরিসংখ্যান। কিন্তু কেন? রাজ্যের কয়েকটি জেলায় প্রতি দশজনে ছ' জনের বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছরের আগে।

দিদি, সম্প্রতি একটা খবর দেখে আমি শিউরে উঠেছি। মালদহের এক কিশোরীর সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু। মেয়েটি ষোলো বছর বয়সে প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। আর উনিশ বছর বয়সে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছে। এটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় দিদি।

গত বছর স্বাস্থ্য দপ্তরের সমীক্ষাতেই দেখা গিয়েছিল, বিভিন্ন জেলার ১৩০টি ব্লকে মোট প্রসূতির ২০-২৯ শতাংশ নাবালিকা। আরও ২৫টি ব্লকে আরও খারাপ। মোট প্রসূতির ৩০ শতাংশেরও বেশি নাবালিকা। এই রাজ্যে মেয়েদের স্কুলছুট এবং কম বয়সে বিয়ে বন্ধ করতেই তো দিদি আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েই কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছিলেন। তা হলে? বিয়ে না করলে তবেই তো শেষ কিস্তির ২৫ হাজার টাকা পাওয়ার কথা। তা হলে কেন কমানো যাচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের এই প্রবণতা? দিদি, আপনিই জবাবটা দিতে পারবেন। কাটমানি নিয়ে কি আপনার ভাইয়েরা এখানেও দুর্নীতি চালাচ্ছে?

রাজ্যেরই রিপোর্ট বলছে, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫, দু'টি অর্থবর্ষে মোট প্রসূতির মধ্যে নাবালিকা প্রসূতির হার ছিল ১৫ শতাংশ। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের অন্তত ১৪ শতাংশ নাবালিকা। যেখানে এমন মৃত্যুর সর্বভারতীয় গড় ৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে সেটা দ্বিগুণেরও বেশি। এসব সংখ্যা ভয়ানক সংকটের একটা ইঙ্গিত মাত্র। তবে পশ্চিমবঙ্গে কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে এত ঢাক পেটানোর মানেটা কী?

নাবালিকা প্রসূতির জীবনের ঝুঁকি যে প্রাপ্তবয়স্কদের চাইতে কয়েকগুণ বেশি, তা তো আপনার জানা দিদি। স্বাস্থ্যব্যবস্থার নিরিখে বিচার করলে এই মৃত্যুগুলি এক বৃহত্তর সংকটের প্রতিফলন। রাজ্যে সার্বিক প্রসূতিমৃত্যুর হারও এক লক্ষ প্রসবে ১০৩, যেখানে জাতীয় হার এক লক্ষে ৯৭।

> **রাজ্যেরই রিপোর্ট বলছে মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে দশজনের মধ্যে ছ'জন বালিকার বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছরের আগে। এই বিপুল ব্যর্থতার মোকাবিলা করতে হলে রাজ্যকে কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো প্রকল্পের খামতিগুলি তো স্বীকার করতে হবে দিদি?**

এই কিশোরীরা যদি বেঁচে থাকত, যদি তাদের স্কুলে রাখা যেত, যদি তাদের জন্য ঘরে-বাইরে হিংসাহীন পরিবেশ নিশ্চিত করা যেত, যদি তাদের উচ্চশিক্ষা, রোজগারে যুক্ত থাকতে উৎসাহিত করা যেত, তবে তো রাজ্যের মঙ্গল হতো। দিদি, রাজ্যেরই রিপোর্ট বলছে মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে দশজনের মধ্যে ছ'জন বালিকার বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছরের আগে। এই বিপুল ব্যর্থতার মোকাবিলা করতে হলে রাজ্যকে কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো প্রকল্পের খামতিগুলি তো স্বীকার করতে হবে দিদি?

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রচুর নম্বর দেওয়ার 'নীতি' যে মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখতে পারছে না তা তো মেনে নিতে হবে। স্কুলশিক্ষাকে ছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয়, অর্থপূর্ণ করে তোলা গিয়েছে কি? এ রাজ্যে ফি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে খবর হয়, প্রসূতি পরীক্ষা দিচ্ছেন। পরীক্ষা দিতে দিতেই প্রসব যন্ত্রণা। নাবালিকা একসঙ্গে চার সন্তানের জন্য দিয়েছেন।

কিন্তু এগুলো তো গর্বের নয় দিদি। লজ্জার। ভাবতে হবে রাজ্যে কী হয়ছে? জানেন দিদি, আপনার ভাইয়েদের হাতে হয়রানি, দুর্নামের ভয়ে দ্রুত মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এত এত পরিবারে। আপনাকে তো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটা মনে রাখতে হবে যে, সুস্থ রাজনীতি কেবল শাসন করে না। সুস্থ প্রশাসনের অর্থ, তা উন্নততর জনজীবনের উপযুক্ত সংস্কৃতি নির্মাণ করে। মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের মধ্যেই রয়েছে, মেয়েদের শিক্ষার উন্নতি, প্রসূতিমৃত্যু হ্রাস, নারী সক্ষমতা বৃদ্ধি। এ সবই ভূলুণ্ঠিত হয় নাবালিকা মায়ের মৃত্যুতে। কিন্তু আপনি শুধুই রাজনীতি করে ১৪টা বছর কাটিয়ে দিলেন। □

অতিথি কলম

পঙ্কজ জগন্নাথ জয়সওয়াল

আত্মনির্ভর ভারত কি পশ্চিমি বিশ্ব তথা চীনের পক্ষে বিপদসংকেত?

আমেরিকার অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ জেফরি স্যাক্সের মতে ওয়াশিংটনের বৈশ্বিক প্রভুত্ব সমাপ্ত হয়ে ভারত এখন বিকেন্দ্রিক বিশ্বে প্রবেশ করেছে। যাতে ভারত, রাশিয়া ও চীনের মতো দেশ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হতে পারে। এখন চীনকে তাদের আগ্রাসনবাদী নীতি পরিত্যাগ করতে হবে এবং স্থানীয় স্থিতিশীলতার জন্য সৃজনশীল পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন অথবা ভারতকে নিজের হিত রক্ষার্থে আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ভারত রাশিয়ার সম্পর্ক ত্যাগ করবে না। বরং আমেরিকা ও ইউরোপই ভারতের উপর বেশি নির্ভরশীল। চীনকে আটকাতে তাদের ভারতকে খুবই প্রয়োজন।

পশ্চিমি বিশ্ব ও চীন ভারতকে নিয়ে কেন চিন্তিত?

সন্ত্রাসবাদকে চীনের প্রকাশ্য সমর্থন এবং সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত পাকিস্তানের মনে সম্প্রতি ভারতের দ্বারা সংঘটিত আকাশপথে প্রত্যাঘাতের বিষয়ে পশ্চিমি বিশ্বের প্রতিক্রিয়া পরিষ্কার যে, ভারতের বিকাশে নয়, বরং বিগত কিছু সময় ধরে প্রদর্শিত আত্মনির্ভরতা ও শক্তি দেখে তারা ভয় পাচ্ছে। যদিও সারা বিশ্ব ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং এছাড়া কোনো বিকল্পও নেই, তবুও পশ্চিমি বিশ্ব এই বিষয়ে চিন্তিত যে, ভারতের শক্তি স্বদেশীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বাকি ক্ষেত্রগুলিতেও কীভাবে সংহত হয়ে উঠছে? পশ্চিমি বিশ্ব তো সেসব দেশ নিয়েই খুশি যারা সব কিছুর জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল, যারা নিজেদের সংস্কৃতিকে ত্যাগ করছে এবং প্রাকৃতিক কাঁচামাল কম দামে তাদের কাছে বিক্রি করছে। পশ্চিমি বিশ্ব জানে যে ভারতের উত্থান কীভাবে বিশ্ব ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। ভারত যত উন্নত হবে পৃথিবীতে ততই শান্তি ও সহযোগিতা বাড়বে। সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদও শোষণমুক্ত হবে। ভারত করোনা মহামারির সংকটজনক সময়ে বহু দেশকে বিনামূল্যে করোনা ভ্যাকসিন দিয়েছে, সংঘর্ষপূর্ণ স্থান থেকে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের উদ্ধার করে এনেছে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আর্থিক ও মানবিক সহযোগিতা করেছে, কোনো লাভ ছাড়াই নিঃস্বার্থ সহায়তার নীতি প্রদর্শন করেছে। এর মধ্যে তুরস্কের মতো দেশও রয়েছে যে কিনা সন্ত্রাসবাদের সমর্থক।

'আত্মনির্ভর ভারত' কেন জরুরি?

আত্মনির্ভরতার দিকে ভারতের যাত্রা এবং তার সমর্থনকারী নীতি আমাদের অর্থব্যবস্থার জন্য লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের অর্থব্যবস্থা বিশ্বের অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতাকে সহ্য করার জন্য আরও ভালোভাবে তৈরি হচ্ছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানের উদ্দেশ্য ভারতের শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য উৎসাহ প্রদান করা এবং তার সঙ্গে ভারতের বিশ্ব সংস্থার দ্বারা উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা। যদি কোনো বিদেশি কোম্পানি ভারতে তাদের সামগ্রী নির্মাণ করে এবং তা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিক্রির জন্য তার ব্যবহার করে তবে পুরো প্রক্রিয়াকে আমরা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বলতে পারি।

সব কিছুর নির্মাণ সম্ভব নয় এবং অন্য দেশ থেকে নিয়ে আসা কিছু কাঁচামালের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে, কিন্তু প্রযুক্তিগত বিকাশের মাধ্যমে যা কিছু নির্মাণ সম্ভব তা দেশেই নির্মাণ করা উচিত। আর যদি তা ভারতে উৎপাদন করা সম্ভব না হয় তবে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সেসব সামগ্রী শত্রু দেশ থেকে না কিনে মিত্রদেশ থেকে কিনতে হবে। আমাদের চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, মালেশিয়া, আজরবাইজানের জিনিস থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। আসুন, আমরা সেই সব দেশকে সহযোগিতা করি যারা ভালো ও খারাপ সময়ে আমাদের পাশে থেকেছে। কোনো শত্রুদেশ থেকে কোনো কিছু কেনা মানে মাওবাদ, সন্ত্রাসবাদকে সহযোগিতার পাশাপাশি আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী তথা জনগণের উপর আক্রমণের আমন্ত্রণ জানানো। সেজন্য আমাদের শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে দ্রুত ও সঠিক পদক্ষেপের সঙ্গে আমাদের শক্তিকে আরও উন্নত করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকা আর্থিকভাবে বিশ্বশক্তি ছিল তাদের শিল্প উৎপাদনের কারণে। তা সত্ত্বেও বর্তমানে ১৯ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণে জর্জরিত। এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকায় আরও শিল্প স্থাপনের চেষ্টায় রয়েছেন। শিল্প উৎপাদনে বর্তমানে চীন বিশ্বের মধ্যে মহাশক্তি। উৎপাদনের নিরিখে তারা প্রায় ২৬ শতাংশ এবং রপ্তানিজাত উৎপাদিত পণ্যের ৩২ শতাংশ অধিকার করে রেখেছে। এটি বহু বছর ধরে চীন সরকার এবং তাদের শিল্পের জন্য ব্যয় ও প্রচেষ্টার ফল, যা চীনকে সেসব ব্যবসায়ের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হিসেবে গড়ে তুলেছে। তারা নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, যেমন অটোমেকার যারা চীনকে নিজেদের মাল প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত মনে করে।

ভারত একটি পছন্দসই বিকল্প রূপে উঠে আসছে। চীন প্লাস ওয়ান মডেল ভারত বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণের জন্য বহুমুখী রণনীতি গ্রহণ করছে। যেমন সেমিকন্ডাক্টর শিল্প এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ব্লক উৎখননের মতো অগ্রণী ক্ষেত্রের জন্য নিলামের আয়োজন করা, শিল্পে উৎসাহ প্রদান এবং আর্থিক প্যাকেজ প্রদান করা। ভারতের শিল্প অর্থব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ, যা সমস্ত স্থানীয় উৎপাদনের প্রায় ১৭ শতাংশ এবং ২ কোটি ৭৩ লক্ষের বেশি মানুষকে জীবিকা প্রদান করে। যদিও বিশ্ব শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের বর্তমান অংশীদারী ২.৮ শতাংশ, এর বিকাশের

মান ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী ও আশাব্যঞ্জক। সম্প্রতি বহু কোম্পানি বিভিন্ন কারণে চীন থেকে দূরে সরে এসেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রমিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। মাথাপিছু চীনা শ্রমিক বার্ষিক ১৭, ০০০ আমেরিকান ডলার উপার্জন করে, যা কোম্পানির কাছে অত্যধিক। অপরদিকে একজন ভারতীয় বার্ষিক ৮,৫৫০ আমেরিকান ডলার উপার্জন করে, যা চীনা শ্রমিকদের গড় বেতনের প্রায় অর্ধেক। যদিও তা এশিয়ান দেশগুলির তুলনায় গড় বেতনের সামান্য বেশি। ভারত ৫৫০ মিলিয়নের বেশি শ্রমসম্পন্ন শক্তি হিসেবে সারা বিশ্বের মধ্যে চীনের পরেই অবস্থান করায় ক্ষতিপূরণ করে থাকে। তা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ভীষণভাবে বৃদ্ধি করেছে। দ্বিতীয় কারণ হলো পশ্চিমি দেশের কাছে চীনের বিরুদ্ধে ভারতই একমাত্র বিকল্প সহযোগী, যেখানে এর মধ্যে অধিকাংশ অটো ও অন্য কোম্পানি কোনো বিরোধীকে সাহায্য করার পরিবর্তে কারখানা স্থাপন করতে, সহযোগীকে উন্নত করতে এবং সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে বেশি সুবিধাজনক মনে করে। যদি এই অবস্থা স্থায়ী হয়, তবে ২০২৫ পর্যন্ত ভারত শিল্প ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে তৃতীয় সর্ববৃহৎ শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। জাপানের আগে চলে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ২০২৮ পর্যন্ত ভারত আমেরিকার চেয়েও আগে চলে যেতে পারবে এবং ২০৩০ পর্যন্ত উৎপাদিত সামগ্রীর রপ্তানির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সবচেয়ে বড়ো দেশ হিসেবে উঠে আসবে। ভারত শিল্পবাজার এবং খেলায় চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। আমাদের বর্তমানে শিল্প ও খেলায় চীনের পরিবর্তে জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার ব্যাপারে ভাবা উচিত, কেননা ভারত এখনও একটি বিকাশশীল উৎপাদন শক্তি।

উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কী কী বাধা রয়েছে এবং সেগুলির সমাধান কীভাবে সম্ভব?

'মেক ইন ইন্ডিয়া' রণনীতি চালু করতে সবচেয়ে বড়ো বাধাগুলির মধ্যে একটি হলো শক্তিশালী বুনিয়াদি পরিকাঠামো এবং রসদ কৌশলের আবশ্যকতা। কুশল উৎপাদন সঞ্চালনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিবহণ ব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এবং বিকশিত শিল্পোদ্যানের আবশ্যকতা রয়েছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সরকার নতুন সড়ক, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরের সঙ্গে শিল্প করিডোর নির্মাণের মতো মুখ্য বুনিয়াদি পরিকাঠামো বিকাশ পরিযোজনা শুরু করে। এছাড়া লগ্নি টানতে এবং পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য সব রকম ব্যবস্থা করতে জাতীয় লগ্নি ও পরিকাঠামো কোষ (এনআইআইএফ) কাজ শুরু করেছে।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' রণনীতির ক্রিয়ান্বয়নে একটি বাধা হলো জটিল নীতি নির্ধারক প্রক্রিয়া এবং আমলাতন্ত্রের ঢিলেমি। এটি সংস্থাগুলিকে ভারতে শিল্প সুবিধা দিতে বাধা দিতে পারে। এই বিষয়টির সমাধানের জন্য সরকারি নীতিনির্ধারক প্রক্রিয়া সুব্যবস্থিত করতে, নথিপত্রগত কাজ কম করতে এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করতে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 'ওয়ান উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স' প্রক্রিয়ায় কাজের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও পারমিট পাওয়ার ব্যবস্থাকে সরল করে দিয়েছে। এছাড়া অনুকূল ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলের কারণে নীতিনির্ধারক সংগঠনগুলির দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র সাফল্যের জন্য সক্ষম কর্মীবাহিনীর উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের ঘাটতি রয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার রোজগার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কৌশল বিকাশের কার্যক্রম শুরু করেছে। এর অন্তর্গত ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশ এবং শিল্পভিত্তিক কৌশল বিকাশ রয়েছে। পাঠ্যক্রমকে শিল্পের আবশ্যকতার সঙ্গে যুক্ত করা এবং এটা সুনিশ্চিত করা, যে ডিগ্রিধারীরা রোজগারের জন্য প্রস্তুত আছে, উদ্যোগ ও শৈক্ষণিক সংস্থার মধ্যে তাদের সহযোগিতাকেও প্রাধান্য দিতে হবে।

একটি অন্য সমস্যা হলো শিল্পক্ষেত্রে গবেষণা ও বিকাশের প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব প্রদান করার মানসিকতার অভাব। সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তির বিকাশ ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্য সরকার গবেষণা ও বিকাশের জন্য নানা ধরনের নীতি গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে গবেষণা ও বিকাশ সম্পর্কিত লগ্নির ক্ষেত্রে ছাড়, প্রযুক্তিগত বিকাশকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প-গবেষণায় সহযোগিতাকে গুরুত্ব প্রদানের মতো কাজ রয়েছে। এসব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য এক অভিনব পরম্পরা নির্মাণ, প্রযুক্তিগত গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং ভারতকে সৃজনধর্মী শিল্পে বিশ্বনেতা রূপে প্রতিষ্ঠা করা। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে এবং প্রভাবী সমাধান চালু করতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচেষ্টায় ম্যানুফ্যাকচারিং বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া এবং লগ্নি টানার চেষ্টা করতে হবে।

যেমন যেমন ভারত শিল্পের উৎকৃষ্টতার পথে অগ্রসর হচ্ছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প দেশের শিল্প ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়বে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এক অভিনব এবং কুশল সংস্কৃতিকে উৎসাহ দিয়ে ভারতকে এক বিশ্ব শিল্পকেন্দ্র রূপে বিকাশ করা। নিয়মিত সংশোধন ও বিকাশের জন্য নিয়মিত দায়বদ্ধতার সঙ্গে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আর্থিক প্রগতিকে প্রধান্য দেওয়া চলতে থাকবে এবং দেশের দীর্ঘকালীন সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করে স্থায়ী রোজগারের সুযোগ করে দেবে।

নিষ্কর্ষ

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য শিল্পসংস্থাগুলিকে, রাজ্যগুলিকে এবং নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির হিতচিন্তকদের ,তাদের প্রচেষ্টাগুলিকে কেন্দ্র সরকারের নীতি ও কাজের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। তাতে গবেষণাভিত্তিক, অভিনব, গুণগত, পরিণামগত এবং কুশল উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ শৃঙ্খল এবং তার বুনিয়াদি পরিকাঠামোর দ্রুত বিকাশ করবে। ভারত যত দ্রুত এগিয়ে যাবে, বিশ্বের পক্ষে ততই তা মঙ্গলজনক হবে। জাতীয় শিক্ষা নীতিকে সমগ্র ভারতে গুণাত্মকভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে চালু করা প্রয়োজন, যাতে গবেষণাপ্রেমী ও সৃজনশীল যুবক নির্মাণ হতে পারে, যারা শিল্পক্ষেত্রের জন্য বিশ্বব্যাপী শক্তিরূপে উঠে আসতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(লেখক একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তিবিদ)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

সন্ন্যাসীর অপমান— সইবে না হিন্দুস্থান

যে বাঙ্গালির প্রতিবাদের কারণে সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করা ব্রিটিশ ১৯১১-তে কলকাতা থেকে দিল্লিতে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তারা কীভাবে আজ প্রতিবাদহীন, কাপুরুষে পরিণত হলো? ১৯১১-তে বাঙ্গালির কী ছিল যা আজ নেই? কীভাবে মাত্র ১০০ বছরে কাপুরুষ হয়ে গেল বাঙ্গালি? ইহুদিরা যদি তাঁদের মা-বোনেদের সম্ভ্রমহানির প্রতিবাদে বিশ্বকে স্তব্ধ করতে পারে, তবে একদা বীর বাঙ্গালি জাতি আজ কেন নির্বিকার? কেন সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলা থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একজন সন্ন্যাসী— কারও পাশে দাঁড়াতে পারছে না কেউ? ১০০ বছরে কী হারিয়েছে বাঙ্গালি যা তাঁদের পিতামহ-প্রপিতামহদের ছিল?

একদিকে যখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে একদল হিংস্র জেহাদি বাঙ্গালি মেয়েদের মাঝরাতে 'পিঠে বানানো'র জন্য ডেকে পাঠাচ্ছে, তখন এক হিন্দু সন্ন্যাসীকে মিথ্যা নারীঘটিত মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এবং দুই ক্ষেত্রেই শহুরে বাঙ্গালি নির্বাক ও উদাসীন। আসলে গত অর্ধশতকে বাঙ্গালি হারিয়েছে তার নিজস্ব চরিত্র ও দর্শন। আর সেটাই বাঙ্গালিকে যেন সব হারাতে সাহায্য করেছে! সেই সময় ব্রিটিশ শাসিত পৃথিবীর আর্থিক শক্তি ছিল কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং শিবপুর বিই কলেজকে অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের সঙ্গে তুলনা করা হতো। কিন্তু ভারতীয়, বিশেষত বাঙ্গালিদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থার উপর এতো অহংকার ছিল যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং চূড়ান্ত সফলও হন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো ইংরেজ প্রবর্তিত কোনো স্কুলের ধারেকাছেও যাননি। স্বামীজীর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, কবিগুরুর বিশ্বভারতী, কিংবা ঋষি অরবিন্দ স্থাপিত জাতীয় স্কুল ও কলেজ (যা এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। রানি রাসমণি, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আলামোহন দাশ, মতিলাল শীল-সহ বসাক, লাহা ও গুঁইদের পরিবারগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য করে ব্রিটিশদের চোখে চোখ রেখে। বাঙ্গালির বিজ্ঞানচর্চা থেকে খেলাধুলায় এমন প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু এর পিছনে যা ছিল তা হলো বাঙ্গালির চরিত্র। কাপুরুষ ছিল না বাঙ্গালি। তাঁদের মধ্যে একতা ছিল। এক পরিবার, এক পাড়া, এক গ্রাম, এক জাতিসত্তা ছিল বাঙ্গালির শক্তি। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ছিল এর ভিত্তি।

১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পরে শুরু হয় বাঙ্গালির চরিত্রকে শেষ করে দেওয়ার খেলা। সব দিক থেকে শেষ হতে থাকে বাঙ্গালি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের অপমানে সেই বাঙ্গালি আজ কেন প্রতিবাদমুখর হচ্ছে না? স্বাধীনতার পরে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের অনুপ্রেরণায় একদল বামপন্থী লেখক, অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সিনেমার পরিচালকরা বাঙ্গালির মনে বিষ ঢুকিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন সিনেমাতে হিন্দুদের ধর্মীয় নেতৃত্বকে খলচরিত্রে পেশ করা হয়েছে। অঞ্জন দত্তর 'ব্যোমকেশ বক্সী' থেকে অপর্ণা সেনের 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার' ইত্যাদি ছবিতে হিন্দুদের দাঙ্গাবাজ হিসেবে প্রচার করা হয়। ঋত্বিক ঘটক বলে গিয়েছেন পূর্ববঙ্গীয়দের মূল শত্রু পাকিস্তানি শাসক নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। ভেঙে পড়েছে বাঙ্গালির শিল্প-বাণিজ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা নাকি বুর্জোয়া! ভেঙে পড়েছে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা। সাউথ পয়েন্ট, পাঠভবন, নব নালন্দা, দোলনা স্কুল, কিশোর ভারতীর মতো স্কুলে রাজার ছেলে আর চাষীর ছেলে আলাদাভাবে মানুষ হওয়ার ব্যবস্থা তৈরি হয়।

এক কথায় মুসলমান শাসক, ব্রিটিশ শাসক যা পারেনি, তা করে গিয়েছে কার্ল মার্কসের শিষ্যরা। মাত্র ৭৭ বছরে প্রায় শেষ বাঙ্গালির জাতিসত্তা। তাই সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতনের ঘটনা থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীর অপমান— সব ক্ষেত্রেই বাঙ্গালি আজ নির্বাক দর্শক। ঢাকার নবাবের ১৯০৬-এর স্বপ্ন সত্যি করতে চলেছে একদল বাঙ্গালির বামমার্গী চিন্তাধারা। সেকুলার শক্তির শাসনে ভারত জুড়েই গেরুয়া বসনের উপর নানা আঘাত ও সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে। ১৯৬৬ সালে গোহত্যা বিরোধী আন্দোলনরত অসংখ্য সাধুসন্তকে দিল্লির বুকে হত্যা করা হয়। ১৯৮২ সালে বিজন সেতুতে ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। ১৯৯০ সালে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদবের নির্দেশে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনরত করসেবকদের হত্যা করে পুলিশ। ২০০৪ সালে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে কাঞ্চীর শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতী মহারাজকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০০৭ সালে গোরক্ষপুর মঠের মোহন্ত ও সাংসদ যোগী আদিত্যনাথকে গ্রেপ্তার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। ২০০৭ সালে একটি মিথ্যে মামলা দিয়ে স্বামী অসীমানন্দজী ও সাধ্বী প্রজ্ঞাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় এবং কারান্তরালে তাঁদের উপর বীভৎস অত্যাচার চালানো হয়। ২০০৮ সালে ওড়িশায় স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ২০২০ সালে মহারাষ্ট্রের পালঘরে দু'জন হিন্দু সন্ন্যাসীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। গত বছরের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে জেহাদি অভ্যুত্থানের পর সেই দেশজুড়ে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব হওয়ায় ইসকনের সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ও শ্যামদাস প্রভুকে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশের প্রশাসন। এই বাম-ইসলামিক ও সেকুলার অনাচারের বিরুদ্ধে এখনও সুযোগ রয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে অনুশীলন-যুগান্তরের দর্শনকে সঙ্গী করে চরিত্র গঠন হোক আপামর বাঙ্গালি জাতির লক্ষ্য। তবে হিন্দু বাঙ্গালি ধীরে ধীরে রুখে দাঁড়াচ্ছে। যেসব সংবাদমাধ্যম আজ থেকে ১ বছর আগেও 'হিন্দু' শব্দ উচ্চারণ করত না, তারা আজ হিন্দু বাঙ্গালির উপর নেমে আসা সন্ত্রাস নিয়ে কথা বলছে। সাধুসন্তরা রাজপথে নামছেন। 'প্রজাপতি'র মতো বাংলা ছায়াছবি হিন্দু সংস্কৃতিকে তুলে ধরছে। পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পরপর দু'টি ছবিতে লাভ-জেহাদ প্রোমোট করার পর সেই অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে তাঁরই তৈরি ছবি 'অর্ধাঙ্গিনী'তে মুসলমান মহিলার সঙ্গে হিন্দু পুরুষের বিবাহ দেখিয়েছেন। স্বাধীনতার পর এরকম সিনেমা টালিগঞ্জে প্রথমবার তৈরি হলো এবং এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় দুর্নীতিগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। ফলে বাঙ্গালি জাগছে। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ আবার জগতে তার নিজের স্থান গ্রহণ করার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছে। □

পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজকে মাদকাসক্তিতে বুঁদ করে রাখতে চায় রাজ্যের শাসক দল

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

একটা প্রস্তাব রইল তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের ছাত্র যুব সংগঠনের কাছেও। তৃণমূলের বক্তব্য অনুযায়ী তারা অন্যায়ের সঙ্গে ঘর করেই না। তাহলে একটা প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়ে যাক, ছাত্র ও যুব সমাজের মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে। হোক জোর প্রতিবাদ। যেহেতু মাঝে মধ্যেই তৃণমূল বলে তাঁরা আত্মশুদ্ধি করে, এই বিষয়ে একবার শুদ্ধীকরণ হোক তবে। যে রাজনৈতিক বেয়াদপির কারখানা এরাজ্যে চলছে তার চাকার বড়ো শক্তি যুবসমাজ এবং তাদের ফুর্তি আসে কারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, পাড়ার চত্বরে, ঠেকে, গুমটিতে মাদক মেলে। তার হিসেব আমাদের হাতে সরকারি ভাবে নেই। কিন্তু ড্রাগ, গাঁজা এবং অন্যান্য নানান 'হরেকরকমবা' নামের মাদক চক্রের খোঁজ বার বার এসেছে সংবাদে, অভিযোগে, খবরে, কখনো পুলিশের জালেও। রাজ্যের নামি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মাদকের আস্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল দল যুবসমাজের সামনে এই আশু লোভটাই পেতেছে। নেশা করো তোমরা, তোমাদের বিচার-বিবেচনা, উন্নত চিন্তা, বিশ্লেষণ, বিরোধ করার শক্তি-ভুলকে ভুল বলার ন্যূনতম জোর, বোধ, সামাজিক দায়িত্ব, লেখাপড়া, চরিত্র, নৈতিকতা জাহান্নামে যাক। ২০১১ থেকে আজকে পর্যন্ত তৃণমূল দেখাতে পারবে না তাদের কোনো যুবনেতা সমাজ, সমাজ বা মানুষের জন্য ব্যতিক্রমী বা গঠনমূলক কোনো কাজ করেছে। দিক না তথ্য। এসব জিজ্ঞেস করলেই তাদের সেই রাজনীতির পঙ্কিল ধারা ধরা পড়বে, যাকে পরিভাষায় বলে 'পলিটিক্যাল ইকোনমি'! এটি এমনই এক অর্থনীতি যা রাজনীতির স্বার্থেই তৈরি, যা ভোট লুট করার কৌশল, যা তথ্যে দেখায়— এই দেখো আমরা রাজস্ব আদায় করছি, বৃদ্ধিও করছি। কিন্তু দেখায় না ওই রাজস্বের জন্য রাজ্যের বাকি সব পথে রাজস্ব আসা থমকে যায়। পশ্চিমবঙ্গের এই 'পলিটিক্যাল ইকোনমি'র অশ্বরথ চলছে মদ্যপান, মদ ব্যবসা, রাজ্য আবগারি দপ্তরের অবাধ দেশি মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার মাধ্যমে। মদ্যপান বিরোধী কোনো ক্যাম্পেইন তো দূরের কথা বরং মদ বিক্রি, মদ্যপানকে প্রোমোট করছে এই সরকার।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ দায়িত্ব নিয়ে দেখাক তো গত দশ বছরে কটা বিজ্ঞান সভা, ইতিহাস সম্মেলন, বিতর্ক সভা, যথাযথ ফুটবল ম্যাচ তারা আয়োজন করেছে বা ক'জন ফুটবলার বা শিল্পী তারা তৈরি করেছে। যে পথে তাদের চলৎশক্তি তা হলো কেবল বেলেল্লাপনা। যতক্ষণ না ধরা পড়ে ততক্ষণ ওরা সমাজ সেবক।

এ এক অতি জীর্ণ অর্থনীতি, কারণ এটা কেবলমাত্রই রাজনীতি। এমন রাজনীতি, যেখানে বলি হচ্ছে এরাজ্যের যুবসমাজ। গোল্লায় গেছে যুবসমাজের বড়ো অংশ। অগণিত ছবি, খবর আসছে সামনে। কলেজে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেলেল্লাপনা, অশ্লীল মন্তব্য, কুরুচিকর প্রস্তাব তো জলভাত এখন। একাংশের তরুণীরাও তা উপভোগ করছে। অনেক সময়ই প্রত্যাশা পূরণ না হলে তখন প্রতিবাদ করার কথা মনে আসে, প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই চটুল নাচ-গান চলে যেন নাইট ক্লাব।

একাধিক ভিডিয়ো চোখে পড়েছে যেখানে মফস্‌সলের কালীপূজা, মনসাপূজাকে কেন্দ্র করে পাড়ার ক্লাবে নেশার আসর এবং স্বল্পবাস তরুণীর অশ্লীল নাচ। ওই ক্লাবগুলি নিশ্চিতভাবে আগের মাসে ডিজে বাজিয়ে 'খেলা হবে' নেচেছিল। কুরুচিকর ইঙ্গিত কলেজ ইউনিয়ন রুম থেকে পাড়ার ক্লাব--- সর্বত্র এক স্বাভাবিক রূপান্তরের রূপ নিচ্ছে। যেন বার্তাটা এরকম— এটাই এবার মেনে নেওয়ার পালা। স্মার্ট বাঙ্গালি হতে হবে তো! আন্তর্জাতিক মানের বাঙ্গালি হতে হবে--- তাই ফ্রি লাইসেন্স সবেতেই। নিশ্চিত, লিঙ্গ বৈষম্যহীন সাবলীল মেলামেশা একান্ত দরকার। কিন্তু সেই দরকার পূরণের আগে আরও বেশি দরকার সেই সাবলীলতা অর্জনের সাবালকত্ব। তার জন্য চাই শিক্ষা।

কলেজ, ইউনিভার্সিটির খাতায় নাম লেখানো আছে— বললে আমরা দশ বছর আগেও এটা বুঝতাম, খুব দুষ্ট ফাঁকিবাজ। সারাদিন খেলে। বা সিনেমা দেখে। বা বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইচই, আড্ডা মারে। ওইসব ফাঁকিবাজ দুষ্ট ছেলেদের ভালো-মন্দ

ফঃ ২

সবেতেই পাওয়া যেত। তৃণমূল কংগ্রেস একটা এমন ‘এগিয়ে বাংলা’ প্রকল্প করল— যেখানে দলে দলে যুবক যখনই নানান অপরাধ অপকম্মে ধরা পড়ছে, তখনই তাদের একটা সাধারণ মিল এটাই— নেশা করে। কারও মাথায় কোনো ‘প্রভাবশালী’ কোনো ‘হেভিওয়েট’ কোনো দাদার হাত যদি থাকে, তাহলে নিশ্চিত সেই অপকম্ম করা ছেলে বা মেয়েটি নেশা করে। মদের নেশায় বুঁদ তৃণমূলি যুবসমাজ। তাই আচরণ ভারসাম্য তারা হারাচ্ছে। হালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কী দেউলিয়া মান, তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। এবার যদি ক্লাবে ক্লাবে টাকা আর মদ আসে, তার সঙ্গে চটুল নাচানাচি ফ্রি! বোধশূন্য তৃণমূলি যুবসমাজের কাছে এতো লটারি! এই মাদকাসক্তি এখন পশ্চিমবঙ্গের মহামারী। যুবসমাজকে নাইজিরিয়ার কোয়ারা রাজ্যের মতো যদি নেশার ঘোরে রাখা যায় তবে তো সোনায় সোহাগা। ওরা মদ কিনছে দেদার, ওরাই দলের গ্রাসরুট, ওরাই পরিসংখ্যানে তৃণমূলকে এগিয়ে রাখছে, ওরাই গুন্ডামি করছে, টাকা তুলছে, ভর্তির সময় মেরিটের তোয়াক্কা ছাড়াই কলার তুলে বলে— এত দাও, ভর্তি হও। এরাই কলেজ ইউনিয়ন দখল করে। নেশাগ্রস্ত বলেই এরা ধর্ষণ করতে পারে। ধর্ষকাম মানসিকতার মালিক কত শত যুবক, তার হিসেব কে রাখছে? সেই পচনশীল মানসিকতা ধর্ষকের চাইতেও ভয়ানক। চীনে পর্যন্ত দেখা গেল— শি জিনপিং প্রশাসন গত ২২ মে অ্যালকোহল ব্যান করল। তারা মনে করছে অবাধ মদ্যপান ও দুর্নীতির মধ্যে যোগ রয়েছে। এবং এ প্রতিষ্ঠিত সত্য-তত্ত্ব। সরকার যখন সুরাসক্তিতে উৎসাহ দেয় বুঝতে হবে সেই সিস্টেম আধমরা।

রাজ্যবাসী সদ্য দেখল, নতুন বছর শুরু হতেই রাজ্য সরকার লক্ষ্য নিল প্রতি পঞ্চায়েতে অন্তত একটি যেন মদের দোকান থাকে। বিগত অর্থবর্ষে মদ বিক্রির ফলে সরকারের প্রতিমাসে গড় আয় হয়েছিল ১৮০০ কোটি টাকা! শুধুমাত্র কলকাতাতেই ৩০০ কোটির! এবার টার্গেট আরও বেশি। প্রতি মাসে খবর আসে আরও দশটা সরকারি স্কুল বন্ধ হলো। বা শিক্ষক নেই। বা শিক্ষক আছে, একটাও ছাত্র নেই। বা স্কুল বারান্দায় ছাগল বাঁধা। স্কুল পালানোর সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলেজে স্নাতকের আসন হাজারে হাজারে খালি। ২০২৩ সালে সারারাজ্যে স্নাতকে শূন্য আসন ছিল ৫৮ শতাংশ। তখন শিক্ষা দপ্তর জোড়াতালি উত্তর দেয়, জাতীয় শিক্ষা নীতি বিষয়ে সবাই সন্দিহান, তাই ভর্তি নেই এমন সব আজগুবি যুক্তি সাজায়। করোনাকালেও এ রাজ্যের মদের দোকান খোলা ছিল। আয় চাইতো রাজ্য সরকার। সরকারের কোষাগার ভরুক, তৃণমূলের যুব ক্যাডার বাড়ুক। এইতো সহজ সমীকরণ। বাঙ্গালি যুব সমাজের অবক্ষয় এই মাত্রাতেও হতে পারে। কেবলমাত্রই নিজের মহলে নিজের রুচির মানুষের সঙ্গে মদ্যপান তাও একরকম মন্দের ভালো। কিন্তু তা যদি দেদার প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা পায় এবং ডাবের জলের মতো অসচেতন অথচ স্মার্ট ফোন ধরা যুবসমাজে বিকোয়, তখন তা চরিত্রকে আপাদমস্তক কলুষিত করে, ভালো মন্দের বিচার বোধটুকুও কেড়ে নেয়, বিকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা তৈরি হয়, শরীর-স্বাস্থ্য-মেধা-রুচি-ভয়-বোধ-শিক্ষা সবকিছুই যখন হরণ করে তখন অবশিষ্ট হিসেবে থেকে যায় লাম্পট্য আর অসভ্যতা করার সহজলভ্যতা।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ দায়িত্ব নিয়ে দেখাক তো গত দশ বছরে কটা বিজ্ঞান সভা, ইতিহাস সম্মেলন, বিতর্ক সভা, যথাযথ ফুটবল ম্যাচ তারা আয়োজন করেছে বা ক'জন ফুটবলার বা শিল্পী তারা তৈরি করেছে। যে পথে তাদের চলৎশক্তি তা হলো কেবল বেলেল্লাপনা। যতক্ষণ না ধরা পড়ে ততক্ষণ ওরা সমাজ সেবক। ধরা পড়লে তখন সে অন্যায়ের সমর্থন করে না তৃণমূল। উপায় কী? সমর্থন করি তো আর বলা যায় না! তাই, আরও একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া যেতে পারে— ঝাড়খণ্ডের মতো শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ অর্থনীতির নানা সূচকে পিছিয়ে থাকা একটি রাজ্যে ২০২২-এ গুমলা জেলার পালকোটে মহিলারাই দেশি মদের বিরুদ্ধে গড়ে তুললেন প্রতিরোধ। কারণ মাতাল থাকলে সামাজিক অশান্তি বাড়ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটা গ্রাম পারবে? তখন তো সেটা আবার হয়ে যাবে রাজ্য সরকারের বিরোধ, কারণ সরকার চাইছে স্কুল বন্ধ হোক, মদের বিক্রি বাড়ুক। ২০২১-এর পূজার পরের দুটো ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের রিপোর্ট আসল-পূজাতে রেকর্ড মদ বিক্রি। রাজস্থানের দুটো গ্রাম পঞ্চায়েতও রেকর্ড তৈরি করল সমান্তরাল ভাবে। রাজসমন্দ জেলার দুটি গ্রামের মানুষ তাদের ৪৫ বছরের পুরনো রাজস্থান এক্সাইজ ল' (Rules 1975 Closure of Country Liquor Shop by Local Option. Published 1976, 8th January) প্রয়োগ করল।

যদি কোনো অঞ্চলের ৫১ শতাংশ মানুষ দেশি মদের দোকানের বিরুদ্ধে থাকে তবে দোকান বন্ধ করার সুযোগ আছে আইনের ওই ধারায়। ওখানে ৯০ শতাংশ মানুষ বলল— না, দেশি মদ দোকান চলবে না। ওদের কিন্তু আমাদের মতো রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ, ঋত্বিক ঘটক, যামিনী রায়, উত্তম কুমারের অহংকারটা নেই জাতিসত্তায়। আমাদের জাতিসত্তার অহংকার সারাবিশ্ব মেনেছে। আকিরা কুরোশাওয়া থেকে উইলিয়ম রোটেনস্টাইন— কে কৃতজ্ঞ নন এই বাঙ্গালির কাছে? মদ খাওয়া কী মন্দ? যদি যুবসমাজ এই প্রশ্ন করে। সত্যিইতো প্রশ্ন বটে। মদ খেয়ে যদি আচরণে অসামাজিকতা অসভ্যতা ইতরামি পাকা জায়গা ধরে, বুঝতে হবে তা অজ্ঞের অতিরিক্ত নেশা হচ্ছে। তখন তাদের হাতুড়ি পেটানি দরকার। তা খুব শক্ত কাজ। ঋত্বিক ঘটক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস বা এমন গুণীজনদের ভাঙিয়ে আর ক'দিন? ‘খেলা হবে টিম’কে এটাই বলার যে, আর একটা ঋত্বিক ঘটক তারা তৈরি করে দেখাক, মাসে ১৮০০ কোটির মদ বিক্রির অঙ্কটা তবে খানিকটা বিচার পাবে। নচেৎ ‘নেশাড়ু বাঙ্গালি’ শুনতে আর বেশি দিন বাকি নেই। পশ্চিমবঙ্গে যুবসমাজের গভীর অবক্ষয়, তাদের মধ্যে চেতনার গুরুতর অভাব সবচেয়ে দুশ্চিন্তার।

হিন্দু সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত
তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ

অভিযোগকারিণী মহিলাকে পুলিশি নিরাপত্তাও দেওয়া হয় পরের দিন থেকে। কেন? তাঁর তো জীবনের ঝুঁকি নেই? তবে? সত্যটা যদি বলে দেন তাই কি! নিয়মিত পাহারাও দিচ্ছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা। সাংসদ, বিধায়করাও যোগাযোগে রয়েছেন।

পিনাকপাণি ঘোষ

কতটা পাপ করলে মহাপাপী বলা যায়? পশ্চিমবঙ্গবাসীর সামনে এটা এখন বড়ো প্রশ্ন। বাম শাসনের পাপ থেকে মুক্তি পেতে রাজ্যবাসী পরিবর্তন চেয়েছিল। বামেরা প্রকাশ্যে সন্ন্যাসীদের জীবন্ত পুড়িয়েছিল বিজনসেতুর উপরে। আর এই সরকার সরাসরি গেরুয়া বসনে কালি লাগাতে চাইছে।

ভারতের সনাতন পরম্পরায় গেরুয়া মানে গুরুর প্রতীক। গেরুয়া মানে ত্যাগের প্রতীক। সেই সূত্রেই গেরুয়া জাতীয় পতাকার সব চেয়ে উপরে জায়গা পেয়েছে। এবার সেই গেরুয়া বসনে কালি লাগাতে মরিয়া তৃণমূল। একেবারে পরিকল্পনা করে কালি লাগানো হয়েছে। আর তাতেই তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

শরীরে যখন বিষের পরিমাণ বেশি হয়ে যায় তখন তা ফুটে ওঠে নানা অসুখের মধ্য দিয়ে। শরীর থেকে পচা গন্ধ বের হতে থাকে। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এখন তৃণমূলের শরীর থেকে পচা গন্ধ বের হতে শুরু করেছে। শুধু দল তৃণমূল নয়, তৃণমূল সরকারের গা দিয়েও। চাকরিহারাদের কান্না, সরকারি কর্মচারীদের ডিএ না পাওয়ার ক্ষোভ, প্রাথমিক শিক্ষকদের অনিশ্চয়তা এসব তো আছেই, সেই সঙ্গে বড়ো পাপ হয়েছে কালীগঞ্জে ছোট্ট তামান্নার মৃত্যুতে। এর পরে কসবার ঘটনা। কলেজেই ছাত্রীকে গণধর্ষণ। তৃণমূলের মেয়েকেই তৃণমূলের দাদারা দল বেঁধে ধর্ষণ করেছে। মুখ দেখানোর জো নেই তৃণমূলনেত্রীর।

তৃণমূলের অনেক পাপের ঘড়া পূর্ণ হতে চলেছে। বিধাতা তাই তৃণমূলের ঘরের পাপ প্রকাশ্যে এনে দিয়েছেন আইন কলেজের ছাত্রীর মাধ্যমে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নাম শোনেননি এমন বাঙ্গালি নেই। সেবার আর এক নাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। অনেকেই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য, ইতিহাস জানেন না কিন্তু সঙ্ঘের সেবা পেয়েছেন। কখনো আর্ত হিসেবে, কখনো তীর্থযাত্রী হিসেবে। ভারতের কোথাও ভূমিকম্প হলে কেঁপে ওঠে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের মন। বন্যা হলে ভেসে যায় তাঁদের কপোল। খরা হলে শুকিয়ে যায় গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের মুখ। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ত্রাণের ব্যবস্থা করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

এমনীতে সন্ন্যাসীরা আলাদা করে পরিচিত হন না সেবা কাজের জন্য। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যই মানুষ চেনে তাঁদের। কিন্তু এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রণবানন্দজী মহারাজ বলে গিয়েছেন, হিন্দুকে 'হিন্দু হিন্দু' জপ করানোই হবে সঙ্ঘের কাজ। হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি ধর্ম-মত ভুলে সকল আর্তকে সেবা করতে হবে। কুম্ভ থেকে গঙ্গাসাগরে সেবা নিয়ে বাঙ্গালির সমস্যা হয় না। কিন্তু যেই গেরুয়াধারীরা ধর্মরক্ষার কথা বলেন, তাঁদের গায়ে সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে দেন এই রাজ্যের 'সেকুলার' বলে দাবি করা হিন্দুরা। খ্রিস্টান মিশনারির রিলিজিয়ন প্রচারকে কিংবা মুসলমান ইমামের মজহবি নির্দেশ দেওয়াকে সাম্প্রদায়িক কিন্তু মনে হয় না। আসলে হিন্দু মানেই তিনি মুখ বুজে থাকবেন। ধর্মরক্ষার কথা বলবেন না। ভাবা হয়, তিনি শুধু আধ্যাত্মিক কথাই বলবেন, কখনো স্বধর্ম রক্ষার জন্য গর্জে উঠবেন না।

কিন্তু সেটাই করেছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অন্যতম ট্রাস্টি কার্তিক মহারাজ— স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী। তাঁর অপরাধ— তিনি

সংবাদিক দীপক ব্যাপারীর মাথার ওপর কার ছবি?

হিন্দুর হয়ে কথা বলেন। হিন্দুকে স্বধর্ম রক্ষার জন্য লড়াইয়ে নামতে বলেন, গর্জে ওঠার আহ্বান জানান। তাঁর সেবাকাজ নিয়ে খুব খুশি রাজ্যের মানুষ। কিন্তু শাসকদল, সরকার খুব অসুখী। তিনি হিন্দুদের 'হিন্দু হিন্দু' জপ করাবেন কেন?

তাই তাঁর দুর্নাম করার চক্রান্ত। সেটাও আবার নারীঘটিত অভিযোগে। কিন্তু বিধাতার মার যাবে কোথায়। ঘটনা যে সাজানো তা অনেকটাই ফাঁস করে দিয়েছেন অভিযোগকারী মহিলাই। বলে দিয়েছেন, দিদিই সব করিয়েছেন। তবে কার্তিক মহারাজের অপরাধ আছে। অপরাধ তিনি বেশি হিন্দু হিন্দু করেন। সন্ন্যাসী প্রদীপ্তানন্দকে অনেকেই হিন্দুদের অভিভাবক মনে করেন। তবে সবচেয়ে বেশি পরিচয় তাঁর সেবাকাজের জন্য। সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনা। সেই জন্যই সম্প্রতি কার্তিক মহারাজ পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন।

আর রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সেই সম্মান নিয়ে ফেরার পরেই চক্রান্ত। কেন হবে না! তিনি যে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার দেখলেই প্রতিবাদ করেন। পৌঁছে যান সেখানে। সরব হন হিন্দুদের পক্ষে। আর এই রাজ্যের শাসকের চোখে তো সেটা বড়ো অপরাধ। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মহিলাঘটিত অভিযোগ সাজাতে চায় তৃণমূল। অভিযোগকারী মহিলার বক্তব্য, এক সাংবাদিককে তিনি নাকি মনের কথাটা জানিয়েছেন। ১২-১৩ বছর আগের কথা। সেই সাংবাদিক মহিলাকে নিয়ে পুলিশে অভিযোগ করতে গেলেন না। যেটা উচিত কাজ হতো। তিনি তৃণমূলের পোষা সংস্থা আইপ্যাকের কাছে চলে গেলেন। তার পরে 'দিদি' (ওই মহিলার বক্তব্য মতো) সবটা দেখতে শুরু করলেন।

যে সাংবাদিককে তিনি সব বলেছিলেন, যিনি আইপ্যাকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তিনি আসলে তৃণমূলের। যে ঘরে বসে তিনি মানে 'সাংবাদিক' দীপক ব্যাপারী যে ঘরে বসেন সেখানে মাথার উপরে থাকে 'দিদি' মানে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। এতেই সব স্পষ্ট হয়ে যায়।

'দিদি' এর মধ্যে না থাকলে কি এত তৎপরতা দেখা যায়! এই রাজ্যে কত ধর্ষণকে 'ছোটো ঘটনা' বলা মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই সম্ভবত পুলিশে অভিযোগ জানাতে কলকাতা থেকে গাড়ি যায় মুর্শিদাবাদের গ্রামে। গাড়িতে আসেন তৃণমূল এবং আইপ্যাকের কর্তারা। কিন্তু কার নির্দেশে? অভিযোগকারিণী বারবার বলেছেন 'দিদি'। একেবারে উপর মহল থেকে সব নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। মহিলাকে পুলিশি নিরাপত্তাও দেওয়া হয় পরের দিন থেকে। কেন? তাঁর তো জীবনের ঝুঁকি নেই? তবে? সত্যটা যদি বলে দেন তাই কি! নিয়মিত পাহারাও দিচ্ছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা। সাংসদ, বিধায়করাও যোগাযোগে রয়েছেন। এসব কথা তো মনগড়া নয়। অভিযোগকারিণী নিজেই জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যমকে ডেকে।

তিনিই জানিয়েছেন ১৩ বছর আগের কল রেকর্ডিং রয়েছে। যেটা নিয়ে পুলিশ তদন্ত করবে কিনা জানি না, তবে মহিলার বক্তব্য অনুযায়ী তৃণমূল ও আইপ্যাকের পক্ষে সেটা নাকি ভাইরাল করা হবে। ইস রে! কেউ যদি এমন সাজিয়ে গুছিয়ে কালীঘাটের কাকুর ভয়েস রেকর্ডিংটা ভাইরাল করত তবে বেশ হতো। শোনা যেত, অভিষেক ২০ কোটিতেই খুশি। যদিও অভিযোগকারিণী যে সময়ের কথা বলছেন তখন সাধারণ ফোনে কল রেকর্ডিঙের সুযোগ ছিল কিনা সেটা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আসলে সবটাই যে ভয় দেখানোর অস্ত্র সে আর কে না জানে?

অভিযোগকারিণী এটাও বলেছেন যে, এর পরে কী কী হবে তিনি জানেন না। দিদিই সব ঠিক করবেন। আসলে দিদির কার্তিক মহারাজের উপরে রাগ অনেক দিনের। দিদির প্রিয় ভাই হুমায়ুন কবীর যখন হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তখন সরব হয়েছিলেন কার্তিক মহারাজ। এটুকুতেই কি দিদির রাগ নাকি! সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ যে জেহাদি হামলা হয়েছে তাঁর বিবরণ দিতে গিয়ে চোখে জল এসে গিয়েছিল কার্তিক মহারাজের। আবার মহেশতলায় তুলসীকে অপমান করার পরেও মহারাজ সরব হন। তুলসীমঞ্চ মাথায় নিয়ে পদযাত্রা করেন। গত লোকসভা নির্বাচনের সময়ে তো কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে রাজনীতি করা এবং পোলিং বুথে তৃণমূলের এজেন্ট বসতে না দেওয়ার অভিযোগও করেছিলেন। তার পরে কলকাতার রাস্তায় খালি পায়ে সাধুদের ঢল নেমেছিল। সামনে ছিলেন কার্তিক মহারাজ।

অনেকে অভিযোগ করলেও, দীঘায় রথের রশি ধরে টানার সময়ে তিনি চটি পরে ছিলেন বলে পাপ হয়েছে বলে এই প্রতিবেদক মনে করে না। আবার বল খেলা, কেউ কেউ বলছে বোম ছোড়ার মতো করে নারকেল ফাটানোর চেষ্টাকেও পাপ বলে মনে হয় না। এতে ধর্মের অপমান বলেও মনে হয় না। ধর্ম অত ঠুনকো নয়। ওখানে ধাম বানানোর চেষ্টাটা অবশ্য পাপ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বলেছেন মহাপাপ হলো— দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা। যে রোগে আক্রান্ত আজ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের একটা অংশ। প্রণবানন্দজী মহারাজ আরও বলেছেন, 'হিন্দুর বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ ও সামর্থ্য আছে, কিন্তু নেই সংহতি শক্তি। এই সংহতি চেতনা জাগিয়ে দিলে হিন্দু আবার জাগ্রত হবে।' এই কথাই প্রচার করেন কার্তিক মহারাজ। সেটাই তো তাঁর অপরাধ।

শুধু তৃণমূল বা বামেরাই নয়, সন্ন্যাসীদের অপমানের বড়ো নজির দেখিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি। মুলায়ম সিংহের দল ও সরকার যোগী আদিত্যনাথের গায়ে কালি লাগাতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পরিণতি কী হয়েছিল তা তৃণমূলের মনে রাখা দরকার। যোগী আদিত্যনাথকে মিথ্যা মামলায় জেলবন্দি করে রাখা হয়েছিল। হাতেনাতে উত্তর দিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের হিন্দুরা। মুলায়ম সিংহ, অখিলেশ সিংহের দলকে এখন প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। এই রাজ্যেও কি এবার একই পরিণতি হবে দিদি-ভাইপো কোম্পানির। কোনো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসনে কালি লাগানোর ছক কষাটা অনেক বড়ো পাপ।

যোগী আদিত্যনাথ এক সময়ে হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন লোকসভায় দাঁড়িয়ে। বিনা অপরাধে তাঁকে জেলে রাখার অভিযোগ ছিল মুলায়ম সিংহ সরকারারের বিরুদ্ধে। আর সেই কান্নার দশ বছর পরে তিনি মুখ্যমন্ত্রী

হয়ে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সমাজবাদী পার্টির দুষ্কৃতীদের প্রতি হুংকার করেছিলেন— মিট্টি মে মিলা দেঙ্গে।

'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। এটা যোগীও মনে করেন। তাই তিনি দোলের সময় উত্তরপ্রদেশের মসজিদ ত্রিপলে ঢেকে দেওয়ার নিদান দেন। করাও হয়। আবার হোলির উদ্যাপনে চড়া শব্দের ডিজে বাজানো নিয়ন্ত্রণ করতেও পুলিশ-প্রশাসনকে নির্দেশ দেন তিনি। আবার স্পষ্ট করে বলে দেন কেন রাস্তায় নমাজ পড়া যাবে না। ঠিক উলটোটা হয় পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যের সর্বত্রই রাস্তায় নমাজ পড়ার ছাড়। আর কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রেড রোডে নমাজ পড়া হয়। খিলাফত কমিটির সেই মঞ্চে ফি বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন। তাঁকে সঙ্গ দিতে ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও যান। সেই মঞ্চ থেকেই তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে বলে আহ্বান জানান। আবার আল্লার কাছে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর প্রার্থনা করেন।

গোরক্ষপুর মঠের তিন প্রজন্মের তিন মহন্ত— গুরু, শিষ্য ও প্রশিষ্যের হাত ধরেই নাথযোগীরা আজ এ দেশে রাজনীতির অন্যতম ভরকেন্দ্র। প্রথমে গুরু দিগ্বিজয়নাথ। ১৯৪৯ সালে 'অখিল ভারতীয় রামসভা' অযোধ্যায় বাবরি ধাঁচার সামনে দশ দিন ব্যাপী রামকথার আয়োজন করে। রামগান হয়, রাতে তখনো পর্যন্ত বিতর্কিত সৌধ যাকে বাবরি মসজিদ বলা হতো সেখানে রামলালা বিরাজমান হলেন। হিন্দু মহাসভার টিকিটে ১৯৬৭ সালে গোরক্ষপুরের সাংসদও নির্বাচিত হন দিগ্বিজয়নাথ। গোরক্ষপুরের মোহন্ত হন তাঁর শিষ্য অবৈদ্যনাথ। ১৯৮৪ সালে রামজন্মভূমি মুক্তিযজ্ঞ সমিতির প্রধান।

অতঃপর তৃতীয় পুরুষ--- মোহন্ত অবৈদ্যনাথের শিষ্য আদিত্যনাথ। তাঁর রাজনীতি আরও গতিময়। দিগ্বিজয়নাথ, অবৈদ্যনাথরা রামমন্দির মুক্তি আন্দোলন করেছেন। আদিত্যনাথ ওইটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলেন না। গোরক্ষপুরের হেমবতীনন্দন বহুগুণা কলেজ থেকে অঙ্কের স্নাতক যোগী। ১৯৯৩ সালে মহন্ত অবৈদ্যনাথের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা। ততদিনে তিনি রামমন্দির আন্দোলনের পুরোভাগে। অতপর ১৯৯৮ সালে বিজেপির হয়ে লোকসভা ভোটে জয়। ২৬ বছর বয়সে তখন তিনিই দেশের সর্বকনিষ্ঠ সাংসদ। তাঁর পূর্বসূরি অবৈদ্যনাথ, দিগ্বিজয়নাথরা হিন্দুত্ব নিয়ে বরাবর সরব হয়েছেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে স্বাধীনতা দিবসে আদিত্যনাথ যে নিদান দিয়েছিলেন তা অভিনব। উত্তরপ্রদেশের সব মাদ্রাসায় স্বাধীনতা দিবস পালিত হচ্ছে কিনা, প্রমাণ-সহ জানাতে হবে।

তাঁর গোটা জীবনটা লড়াইয়ে ভরা। হার মানেননি। কিন্তু একবার অত্যাচারের মুখে পড়ে লোকসভায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন যোগী। স্পিকারের আসনে তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে জয়ী সিপিএম সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। যোগী আদিত্যনাথ তখন বিজেপির সাংসদ। ২০০৭ সালে মহরমের তাজিয়া নিয়ে গোলমাল হয় এবং ২৫ জানুয়ারি মিনারা মসজিদের কাছে রাজকুমার নামে এক হিন্দুকে মেরে ফেলা হয় পুলিশের সামনেই। মূল অভিযুক্ত ছিলেন মহম্মদ শামিম। গোরক্ষপুরের জেলাশাসক নির্দেশিকা জারি করেন যে, যোগী আদিত্যনাথ রাজকুমারের গ্রামে যেতে পারবেন না। কিন্তু যোগী সেই নির্দেশ মানেনি। প্রায় মাঝরাতে রাজকুমারের বাড়ি যান এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের বলেন, 'যদি এক শ্রেণীর লোক আপনাদের উপর জুলুমবাজি করে, আপনাদের ঘর, দোকানের উপরে হামলা চালায় তাহলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব না।' একই সঙ্গে যোগী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'গোরক্ষপুরে আর কোনো তাজিয়া বার হবে না। আমি চ্যালেঞ্জ করছি কোনো জুলুস বের হবে না।' তারপর পুরো গোরক্ষপুর এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস বদলে গিয়েছিল।

পরেরদিন যোগী কুশীনগরে যান একটি রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে। কুশীনগর থেকে বেরিয়ে গোরক্ষপুর যাওয়ার পথে জগদীশপুরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পুলিশ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে যোগীকে গ্রেপ্তারের পর ঠিক কী কী হতে চলেছে। চার কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে থানায় পৌঁছাতে সময় লেগে যায় ৮ ঘণ্টা। হাজার হাজার হিন্দু যুবা বাহিনীর কার্যকর্তা, বিজেপির কার্যকর্তারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। পুলিশকে আটকে রাখা হয়। পুলিশ বাধ্য হয় যোগীকেই অনুরোধ করেন, যাতে যোগী উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করেন আর তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

ধীরে ধীরে হাজার হাজার মানুষের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে পরিণত হয়। যোগীকে জেলে তো ঢোকানো হয় কিন্তু তারপর রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়তে থাকে। ২৭ জানুয়ারি জেল হয় আর ২৮ তারিখ গোরক্ষপুর লোকেলোকারণ্য হয়ে যায়। সরকার গোরক্ষপুর এবং আশেপাশের এলাকায় কার্ফু জারি করে। প্যারা মিলিটারির সংখ্যা বাড়ানো হয়। গোরক্ষপুরের দোকানদাররা ঘোষণা করেন যতক্ষণ না যোগীকে মুক্ত করা হবে তাঁরা দোকান বন্ধ রাখবেন। তাই হয়। যোগীর সমর্থনে পুরো গোরক্ষপুর রাস্তায় নেমেছিল। বহু সাধারণ মানুষ যোগীর জন্য নিজেদের গ্রেপ্তারের দাবি করতে থাকেন।

গোটা উত্তরপ্রদেশ তখন উত্তপ্ত। মুলায়ম সিংহের সরকার ঘোষণা করে যাঁরা চাইবেন তাঁরা যোগীর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ পৌঁছে যান তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এখান থেকেই নতুন একটি স্লোগান ওঠে, 'গোরক্ষপুর ইয়া পূর্বাঞ্চল মেঁ রহেনা হোগা তো যোগী যোগী করনা হোগা।'

৭ ফেব্রুয়ারি যোগীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এর পরেই সংসদে গিয়ে নিজের আবেগ চেপে রাখতে পারেননি। কেঁদেছিলেন। আর দশ বছর পরে ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেন— 'মিট্টি মে মিলা দেঙ্গে।'

অতীতের এই ঘটনার উল্লেখ করার কারণ, পশ্চিমবঙ্গের শাসককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সপার পরিণতির কথা। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, কোনো সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসনে কালি লাগাতে চাওয়া শক্তির বিরুদ্ধে কেমন গর্জন, কেমন প্রতিবাদ, কেমন সাজা দরকার। □

অবিলম্বে ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনকানুনের সংস্কার প্রয়োজন

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

কয়েকদিন আগে এই প্রতিবেদকের এক সহকর্মী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে চতুর্থ বিভাগের এক কর্মীকে বললেন— মুসলমানদের সম্পত্তি সরকার নিয়ে নিচ্ছে। তাঁর গলায় দুঃখ। তিনি ধর্মান্তরিত মুসলমান। আমি বলতে পারতাম— মুসলমানদের সম্পত্তি মানে তার গাড়ি, বাড়ি, ব্যাংকব্যালান্স— সব কিছুই কি সরকার, বলাবাহুল্য, কেন্দ্র সরকার নিয়ে নিচ্ছে?

আমাদের দেশের এই অবস্থা— যাঁরা শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজে মানসম্মান দাবি করেন, দেশের ছেলে-মেয়েদের সুনাগরিক করার ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের বর্তমানে বহুচর্চিত, বিতর্কিত বিষয় ওয়াকফ সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণাই নেই। তার চেয়েও দুর্ভাগ্য, যাদের স্পষ্ট ধারণা আছে, তারাও ক্ষুদ্র কায়েমি স্বার্থের জন্য সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে চলেছেন। এমন দেশ কি সত্যই এই পৃথিবীতে আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন? সম্ভবত নয়। দেশের সংসদের বিরোধী দলনেতা বিদেশে গিয়ে কেবল দেশের বদনাম করে চলেছেন— এমন কোনো নেতা কি সারা বিশ্ব তন্ন তন্ন করেও আপনি পাবেন? জানি না, এটা এ দেশের দুর্বলতা না তুলনাহীন উদারতা?

ওয়াকফ আসলে কী? ওয়াকফ হচ্ছে এমন সম্পত্তি যা কোনো মুসলমান তার সম্প্রদায়ের জন্য নিঃশর্তে দান করে। সম্পত্তিদাতার পরিবারের সদস্য এবং তার উত্তরাধিকারীদের ভরণপোষণের জন্যও বিভিন্ন সম্পত্তি 'ওয়াকফ' ঘোষিত হয়ে থাকে। যদিও ওয়াকফের অধিকাংশ জমি ব্রিটিশ শাসনের সময়কার। ব্রিটিশরা মুসলমানদের মন জয় করার জন্য তাদের জমি দান করেছিল। দেখতে গেলে ওয়াকফের সম্পত্তির প্রারম্ভিক ইতিহাস ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। দেশভাগের সময় যেসব মুসলমান ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যায়, তাদের সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু যেসব হতভাগ্য ভারতীয় পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এল, পাকিস্তানে তাদের সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে চিহ্নিত হলো। ২০১৪ সালে বিদায়ী ইউপিএ সরকার দিল্লির কেন্দ্রস্থলে ১২৩টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারি অধিকার সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেয় এবং তা ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ধার্য হয়। ফলে, ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯১৩টি ক্ষেত্রে ৮ লক্ষ ২ হাজার একর ভারতীয় জমি রাজ্যগুলির ওয়াকফ বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের অধীনে চলে আসে। এসব তথ্য ওয়াকফ অ্যাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে গৃহীত। ওই ওয়েবসাইটে রয়েছে— 'একবার ওয়াকফ, চিরকাল ওয়াকফ'। আর এটা কোনো শিয়া বা সুন্নির স্লোগান নয়। ১৯৯৮ সালের সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ড. আনন্দের। আর একথা চরম সত্য যে, কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ হলে তা কোনোভাবেই বিক্রয়যোগ্য নয়, আর সেই সম্পত্তি থেকে প্রাপ্য টাকা শরিয়তি আইন অনুসারে ব্যবহার্য।

বিপজ্জনক কেন?

ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলের নিজস্ব বিচারব্যবস্থা বা ট্রাইব্যুনাল আছে, আছে নিজস্ব আইনকানুন। ওয়াকফের ৪০ নম্বর ধারা অনুসারে ওয়াকফ বোর্ড যদি যেকোনো সময় কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ বলে ঘোষণা করতে পারে, আর এটা যে ওয়াকফ নয়, তা প্রমাণ করার দায় সম্পত্তির মালিক। যতক্ষণ পর্যন্ত তা প্রমাণিত হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মালিকানা ওয়াকফ বোর্ডের। এমনকী ওয়াকফ জরিপ বিভাগ যে জমি জরিপ করে থাকে তার ব্যয়ভার বহন করবে সম্পত্তির মালিক। এখন, বোর্ডের ক্ষমতা দেওয়ানি আদালতের সমতুল্য। আর বিচারের প্রত্যাশায় সম্পত্তির মালিককে শরণাপন্ন হতে হবে ওয়াকফ বোর্ডের কাছেই। এখানে বিচারের বাণী নীরবে কাঁদবে না মুচকি হাসবে তা সহজেই অনুমেয়। ওয়াকফ বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। অন্য কোনো প্রশাসন এতে নাক গলাতে পারবে না। বরং ওয়াকফের আদেশনামাকে বাস্তবায়িত করতে বাধ্য থাকবেন জেলাশাসক এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক।

তা হলে এই দাঁড়ায়, রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ শুনতে ওয়াকফ বাধ্য নয়, কিন্তু রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের প্রশাসন ওয়াকফের নির্দেশ কার্যকর করতে বাধ্য, যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডকে সংবিধানের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া-সহ দেশের মধ্যে থেকে একটি সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্তরে ওয়াকফ বোর্ডের স্বাধীনতা, ক্ষমতা প্রয়োগ বা স্বেচ্ছাচারিতা এতই যুক্তিহীন যে, তামিলনাড়ুর একটি দেড় হাজার বছরের প্রাচীন মন্দির-সহ গোটা একটি গ্রামকে এই বোর্ড 'ওয়াকফ' বলে দেগে দেয়। বস্তুত মন্দিরটি যখন নির্মিত হয় তখন ইসলামের জন্মই হয়নি। কতটা হাস্যকর আর বিপজ্জনক এই আগ্রাসনের নীতি!

ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে বা ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে একমাত্র হাইকোর্টে মামলা করা যায়। কিন্তু হাইকোর্টে যাওয়ার মতো সময়, শক্তি, অর্থ ক'জনের আছে?

ইউপিএ সরকারের বিদায় লগ্নে 'দ্য ওয়াকফ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৩' হিন্দুদের সম্পত্তি, মন্দির উচ্ছেদে উৎসাহ দিয়েছে। ওয়াকফ বোর্ড যেকোনো সম্পত্তিকে অবৈধ এবং ওয়াকফের অধীন বলে মনে করলে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ইসলামি পতাকা স্থাপিত করতে পারে। একি শুধু হিন্দুর সম্পত্তি গুঁড়িয়ে দেওয়া? ভারতীয় সংবিধানকেই গুঁড়িয়ে দেওয়া নয়? শিখদের জন্য, খ্রিস্টানদের জন্য এরকম কোনো ধর্মীয় বোর্ড নেই। এমনকী তুরস্ক, মিশর, সুদানের মতো মুসলমান দেশেও ওয়াকফ বোর্ডের অস্তিত্ব নেই।

সময়ের দাবিকে মেনে বর্তমান কেন্দ্র সরকার ওয়াকফ বোর্ড আইনকে সংশোধন করে তাকে যুক্তিনির্ভর, গণতান্ত্রিক, আধুনিক করতে চেয়েছে যার সঙ্গে মুসলমান মাদ্রাসা, কবরখানা, এতিমখানা, ইদগা কেড়ে নেওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই, যা ভ্রান্ত এক শ্রেণী ও ভোটব্যাংকের রাজনীতির কারবারিরা পথে ও পার্লামেন্টে ক্ষমতা দখলের জন্য দেশকে অশান্তও অস্থির করে তুলছে। ▫

হিন্দুশূন্য বাংলাদেশ অচিরেই সোশ্যাল ক্যাপিটাল শূন্য দেশে পরিণত হবে

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী অহমদ ছফা অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে তিন দশক আগেই বলেছিলেন, 'যে দেশে গুণীজনের কদর নেই সে দেশে গুণীজন জন্মায় না।' তার এই কথা আজকে শুধু বাস্তবেই নয় বরং আরও একটু বেড়ে গিয়ে 'সোশ্যাল ক্যাপিটাল' (সামাজিক মানব সম্পদ পুঁজি) শূন্য দেশে পরিণত হয়েছে। কাজটা সুকৌশলে মনোযোগ সহকারে সম্পাদনা করা হয়েছে। এর জন্য দায়ী ভারতের মুসলমান তোষণকারী নেতা জওহরলাল নেহরু। দেশ বিভাগের সময়ে নেহরুর কাজে ও মনে সমন্বয় ছিল না। তিনি দেশভাগ করেছেন ঠিকই। দেশভাগের মূল উদ্দেশ্য কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এখনো এই জঘন্য প্রতারণার প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছেন হিন্দুরা। গত একশো বছরে হিন্দুদের উপর অকারণে বারবার নৃশংস অত্যাচার করার ফলে পূর্বপাকিস্তান হতে হিন্দুরা নিঃস্ব হয়ে শুধু প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ফেলে দেশান্তর হতে বাধ্য হয়েছেন। হিন্দুদের মনে আজকে বিশাল ক্ষোভ জমেছে। এই ক্ষোভ নিরাময়ের চিন্তা স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলই প্রয়োজন মনে করেনি। তারা বরাবরই হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এমনকী ফতোয়া জারি করে হিন্দুদের উপর সবসময় অন্যায়ভাবে অত্যাচার সংঘটিত করেছে। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। দেশটিতে যারাই ক্ষমতায় এসেছে সকলেই হিন্দুদের টার্গেট করে দস্যুর মতো অত্যাচার করেছে।

বাংলাদেশ হতে যে সকল মেধাবী গুণীজন দেশ ছেড়ে ভারতে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন দেশে গেছেন তাঁদের অনেকেই আজকে নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁরা দেশ পরিচালনায়, নীতি নির্ধারণে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আবিষ্কারক, কবি সাহিত্যিক-সহ বুদ্ধিজীবী হিসেবে সম্মানের সঙ্গে সেই সেই দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁরা যদি ওই ভূখণ্ডে থাকতে পারতেন তা হলে বাংলাদেশ আজকে পৃথিবীতে একটি কীর্তিমান দেশে পরিণত হতে পারতো। নেহাত মজহবি গোঁড়ামির কারণেই আজকে দেশটি শুধু মেধা শূন্যই নয়, সোশ্যাল ক্যাপিটাল শূন্য হয়ে পড়েছে। আজকে দেশটি অস্তিত্বহীনতার সংকটে ভুগছে। দেশটিতে আজ নর পশুতে পরিপূর্ণ। বিশ্বে তাদের পরিচয় উগ্রবাদী তৈরির কারখানার দেশ হিসেবে। ওখানে মেধা সংকটের কারণে সৃষ্টি হয়েছে পশুপ্রবৃত্তি।

জাতীয় সংগীত হিন্দুর লেখা, তাই সেটা রাখা যাবে না। হিন্দুর হাতে খাবে না। হিন্দুর সেলুনে চুল কাটাবে না। হিন্দুর দোকানে কেনাকাটা করবে না। হিন্দুতে তাদের বড়ো অ্যালার্জি। তাদের আল্লা নিষেধ করে গেছেন। কিন্তু অসুখ হলে আবার ভারতে এসে চিকিৎসা করানো যাবে।

মাথায় ফেজ টুপি লাগিয়ে গণভবনের হাঁস, মুরগি, ছাগল, এমনকী শৌচাগারের প্যান সগৌরবে কাঁধে করে তুলে নিয়ে তারা ধন্য হয়েছে। তথাকথিত মেধাবীরা মহিলা প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্বাস উঁচিয়ে সুখে আত্মহারা হয়ে গান গেয়ে নেচেছে। জাতীয় সংসদের এমপিদের চেয়ারে বসে টেবিলে পা উঠিয়ে বিড়ি ফুঁকেছে। এইরূপ কাজ অবনমিত রুচি ও মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের নয় কি? ওদের কি মানুষ বলা যেতে পারে? ওদের বিশেষ জীব হিসেবে বললেও সেই জীবদেরই অপমান করা হয়ে যাবে। যে দেশের মওলানারা মাদ্রাসায় শিশু বলাৎকার করে, অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে হোটেলে রাত্রিযাপন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তারাই এখন সেখানে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আসীন হয়েছেন। এক সময়ে যে সকল মুসলমান মোল্লা-মৌলবি সুদ হারাম বলে গলা ফাটিয়েছেন, ড. ইউনুসকে সুদখোর বলে গালি দিয়েছিলেন, তারাই এখন ইউনুসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রশংসা এই জন্যই করছে তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন। সন্ত্রাসী দেশ তৈরিতে তারা এখন তৎপর হয়ে উঠেছে। তারাই হিন্দুদের মন্দির গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, বিগ্রহ ভেঙে দিচ্ছে, মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করছে। দেশ মেধাশূন্য হওয়ার কারণে ভিন দেশ থেকে মেধার আমদানি না করে অবৈধভাবে অস্ত্র আমদানি করে। মেধা চর্চা না করে তারা মেধাবীদের হত্যা ও গুম করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জুতাপেটা, কান ধরে উঠ-বোস করানো এবং শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে উল্লাস প্রকাশ করা দেশটিতে কোনো ব্যাপার নয়। যারা মেধাবী গড়ার কারিগর তাদের এহেন অবনমন বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে।

হিন্দু শিক্ষক, হিন্দু কর্মচারীদের পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। দেশটিকে হিন্দুশূন্য করাই এখন তাদের একমাত্র কাজ। কথায় কথায় ভারতের বিরোধিতা করে, অকৃতজ্ঞের মতো

লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে মিথ্যাচার করে চলেছে। নিজ দেশের স্থপতিকে অপমানিত করে শত্রু দেশের স্থপতিকে কুর্নিশ করছে। এক সমুদ্র রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত পতাকাকে এখন পায়ের নীচে ফেলে দিয়ে নমাজ আদায় করছে, আল্লাকে ডাকছে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, তাদের আল্লা কি এই অপকর্মের হোতাদের জন্য বেহস্তে ফ্ল্যাট বরাদ্দ করে রেখেছেন? কতটুকু নীচ ও পাষণ্ড হলে অন্য দেশের পতাকাকে মাটিতে ফেলে তার উপর দিয়ে হেঁটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে ছাত্ররা। তাদের এই আচরণ বিশেষ প্রাণীদের মধ্যেও অনুপস্থিত। এদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা তো নয়ই বরং বিশাল বীরত্বের জন্য পুরস্কৃত করা হচ্ছে। যে যত ভারতবিরোধী সে তত বড়ো মাপের নেতা। ১৯৬৯ সালে ও একই কায়দায় মেধাবীদের হত্যা করে দেশটিকে পাকিস্তানি বর্বরেরা মেধাশূন্য করে তুলেছিল। পুনরায় ৫৩ বছর পর আবার একই কায়দায় পুরনো শত্রুদের দিয়ে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা বাস্তাবায়ন করা হচ্ছে। মেধাটা তাদের মানায় না, তাদের কাছে অসহনীয়। শুধু ভারত বিরোধিতা, হিন্দু বিরোধিতা আর ফতোয়া দানই তাদের একমাত্র কাজ। মিথ্যাচার, দ্বিচারিতা, সুবিধাবাদ, জেহাদ তাদের রক্তে।

ইদানীং আবার সংবিধান ও দেশের নাম পালটানোর কথা শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে জাতীয় সংগীতও। জাতীয় সংগীত হিন্দুর লেখা, তাই সেটা রাখা যাবে না। হিন্দুর হাতে খাবে না। হিন্দুর সেলুনে চুল কাটাবে না। হিন্দুর দোকানে কেনাকাটা করবে না। হিন্দুতে তাদের বড়ো অ্যালার্জি। তাদের আল্লা নিষেধ করে গেছেন। কিন্তু অসুখ হলে আবার ভারতে এসে চিকিৎসা করানো যাবে। আল্লা এই ব্যাপারে আইন শিথিল করে রেখেছেন। কতো বড়ো নিকৃষ্ট মানসিকতার হলে এইরকম ধারণা পোষণ করা যেতে পারে? সম্প্রতি নরসিংদীতে মৃত এক হিন্দু শিক্ষকের জানাজা দেওয়া হয়েছে। এতে কীসের ইঙ্গিত বহন করে?

তবে কি হিন্দুরা চেয়ে চেয়ে দেখবে? না, তা আর হবে না। এবার হিন্দুরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। চলমান নৈরাজ্য এবং সকল প্রকার হিন্দু নিগ্রহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হিন্দুরা মরণপণ প্রতিজ্ঞা করেছে। তারা আর দেশ ত্যাগ করবে না, বরং সমানে সমানে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে। জেহাদি মুসলমানরা এবার হিন্দুদের শক্তি দেখতে পেয়েছে। হিন্দুদের কারাগারে ভরে দেওয়া হচ্ছে। দেশের ভালোর পক্ষে যাঁরা বলছেন, তাদের জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে। দেশের অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হিন্দু সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে কোনো কারণ ছাড়াই জেলে ভরে রেখেছে। তাতে কী? জেহাদিরা জানে যে, কংসের কারাগারেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে। হাজার হাজার চিন্ময়প্রভু এখন বাংলাদেশ কাঁপিয়ে যাচ্ছে। জানান দিয়ে চলেছে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের দিন শেষ হয়ে গেছে। চিন্ময়প্রভু বলেছেন, 'আমরা ওলন্দাজ নই, আমরা মুঘল নই, আমরা ফরাসি নই, আমরা ব্রিটিশ নই, আমরা উড়ে আসিনি। আমরা প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র, বলি মহারাজের প্রপৌত্র বঙ্গের বংশধর। মহারাজ বঙ্গের নাম অনুসারে যে বঙ্গভূমি আমরা তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমাদের এখানে অধিকার রয়েছে। এই অধিকার থেকে আমাদের কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। কেউ চেষ্টা করলে আমরা তা মেনে নেবো না।' সুতরাং হিন্দুদের নিজ ভূমি রক্ষায় হিন্দুরা এবার সার্বিকভাবে প্রস্তুত রয়েছেন। হিন্দুদের এই অভূতপূর্ব প্রতিরোধ তাদের লক্ষিত স্থানে পৌঁছে দেবেই। অন্যায়, অসত্যের পরাজয় এখন সময়ের অপেক্ষায়। জেহাদি মুসলমানদের পতন নিশ্চিত তা সূর্য উঠার মতো সবাই দেখতে পাবে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তা রুখে দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে উঠছে। ভারত সরকারও সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। দমনপীড়ন যতই করুক না কেন এবার হিন্দুরা মাথা নোয়াবে না। তবে সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক বঞ্চনার অবসানের প্রয়াসও চলমান রয়েছে। গুণীজন শূন্যতায় ভুগছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মাটিতে জন্মাচ্ছে না গুণীজন। টান পড়েছে সোশ্যাল ক্যাপিটালের। হিন্দু বিতাড়নের পরিকল্পনা যতই করুক না কেন, সেটা ভেস্তে যেতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মানব সম্পদের সংকট ও বাংলাদেশকে দেউলিয়া ও ব্যর্থ দেশে পরিণত করবে।

ইসকনের মতো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নিষিদ্ধ করার কথা বলে জেহাদিদের আশকারা দেওয়ার মাধ্যমে উপদেষ্টারাও যে হিন্দু বিরোধী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ যেন ঠিক আগুনে হাওয়া দেওয়ার মতো। তাদের জানা উচিত, আগুনে হাওয়া দিলে কী হতে পারে। হিন্দু-সহ সকল নৃগোষ্ঠীর বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এবং তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জেহাদিদের শেষ ঘণ্টা বেজে যাবে তা একেবারে নিশ্চিত। □

বিশেষ ঘোষণা

স্বস্তিকার পাঠক-পাঠিকা, প্রচার প্রতিনিধি, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, গত ৭৭ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বস্তিকা সাপ্তাহিক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু স্বস্তিকা পাঠে আগ্রহী বহু মানুষের কাছে ভাষাগত কারণে এটা সহজপাঠ্য হচ্ছিল না। ফলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কিছু স্বস্তিকাপ্রেমী স্বস্তিকাপাঠ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। সেইসব হিন্দিভাষী পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ ও অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউণ্ডেসন-এর পক্ষ থেকে স্বস্তিকা-র হিন্দি সংস্করণও প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শুভ জন্মাষ্টমী তিথির প্রাক্-লগ্নে আগামী ১৫ আগস্ট হিন্দি স্বস্তিকা (মাসিক) আত্মপ্রকাশ করবে। আপাতত মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রতিমাসের ১৫ তারিখে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। মূল্য ধার্য হয়েছে ৩০্ টাকা।

আপনাদের সহযোগিতা, ভালোবাসা ও পরামর্শ এই নতুন সংস্করণটির চলার পথকে সমৃদ্ধ করবে— এটাই আন্তরিকভাবে কামনা করি।

প্রকাশক,
শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্টেসন

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন জামাতের একটি কূটচাল

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন কথাটি নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে। এটি জামাতের প্রস্তাব, নতুন কিছু নয়, সম্ভবত ১৯৯০-র দশকে গোলাম আজম প্রথমে এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে। জামাত জানে বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিতে জিতে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব নয়, তাই এ নতুন মারপ্যাঁচ। তাঁদের অনেকগুলো যুক্তির মধ্যে একটি হচ্ছে, অনেকরকম নির্বাচন তো দেখলেন, এবার সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন করে দেখুন। অর্থাৎ আপনি তো অনেক রকম খাবার খেয়েছেন, এবার আবর্জনা খেয়ে দেখুন! সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন প্রসঙ্গ সামনে আনা হয়েছে সময় ক্ষেপণের জন্যে, এতে আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি ব্যতীত অন্যদের লাভ।

কিছু হিন্দু সংগঠন এই নির্বাচনের পক্ষে কথা বলছে, আসলে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন হিন্দুরা যা ভাবছে বিষয়টি তা নয়। এতে হিন্দুদের কোনো লাভ নেই। সেই ব্যাখ্যায় পরে আসছি, আপাতত সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন কী তা বোঝার চেষ্টা করি। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন মানে ভোটের সংখ্যা। অর্থাৎ কোনো নির্বাচনে কোনো দল প্রদত্ত ভোটের কত শতাংশ ভোট পেতে পারে সেই অনুসারে আসন বণ্টন হবে। সচরাচর সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আওয়ামি লিগ ৪২ শতাংশ, বিএনপি ৪০ শতাংশ, জাপা ৬ শতাংশ, জামাত ৬ শতাংশ, জাসদ-বাম ২ শতাংশ, এনসিপি ১ শতাংশ, হিন্দু লিগ ১ শতাংশ, ইসলামি জোট ১ শতাংশ এবং জনতা পার্টি ১ শতাংশ ভোট পেতে পারে। সেই অনুপাতে ৩০০ আসনে আওয়ামি লিগ পাচ্ছে ১২৬টি আসন। যে দল ১ শতাংশের কম ভোট পাবে তাদের কোনো প্রতিনিধি থাকবে না।

ওপরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, আওয়ামি লিগ বা বিএনপি কেউই এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। জাপাকে সঙ্গে নিলেও হচ্ছে না। জামাতকে নিতে হবে। এটাই জামাতের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি। এজন্যে জামাত সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন চায়, এতে তারা কম ভোট পেয়েও বেশি আসন পাবে, বড়ো দলের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারবে। জামাতকে সঙ্গে নিলে জামাতের কথা শুনতে হবে। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনে ভোটার প্রার্থীকে ভোট দেবে না, দলকে ভোট দেবে। এতে প্রার্থীর গুরুত্ব থাকবে না, জনপ্রিয় ভালো প্রার্থীরা এককভাবে জিততে পারবেন না, স্বতন্ত্র প্রার্থীর জেতার সম্ভবনা থাকবে না। দলের হাতেই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকবে। দল মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে যেকোনো প্রার্থীকে সংসদে পাঠাবে। দলীয় কর্মীরা অবহেলিত হবেন।

হিন্দু সংগঠনগুলো ভাবছে তারা সংখ্যালঘু সংখ্যানুপাতে ১০×৩=৩০টি আসন পাবে। বিষয়টি তা নয়, বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলই সংখ্যালঘুদের সেই সুযোগ দেবে না। এই প্রক্রিয়ায় হিন্দুদের পক্ষে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসাটা কঠিন হবে। গত ৫৩ বছরে কোনো সরকার কোনো হিন্দু রাজনৈতিক দলকে অনুমোদন দেয়নি। ২০২৫-এ একটি মাত্র দল অনুমোদন পেয়েছে। ধরে নেওয়া যাক আরও ২/১টি দল অনুমোদন পাবে। এরা একত্রে ভোট করলে কত ভোট পাবে? অন্য বড়ো দলের সঙ্গে জোট বাঁধলে তো 'যেই লাউ সেই কদু'। দলীয় এমপি'র কী অবস্থা সেটা তো বিগত আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে বোঝা গেছে। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন তত্ত্বটি হিন্দুদের আরও কোণঠাসা করবে।

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন জামাতের একটি কূটচাল। জামাত ইসলামি দলগুলো নিয়ে ৫-৭ শতাংশ ভোট পেলেও ১৫/২০টি আসন ধরে রাখতে সক্ষম হবে। নির্বাচন হলে জামাত হয়তো এনসিপিকে নিয়ে এ খেলা খেলতে চাইবে। উপরোক্ত পরিসংখ্যান বা যুক্তিতর্ক সবই নির্বাচন হলে জামাত হয়তো এনসিপিকে নিয়ে এ খেলা খেলতে চাইবে। উপরোক্ত পরিসংখ্যান বা যুক্তিতর্ক সবই নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হলেই প্রযোজ্য। বাংলাদেশের মূল সমস্যা 'সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন'। বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থায় ধস নামিয়ে দিয়েছে জিয়া, এরপর এরশাদ, ২০০১-এ খালেদা জিয়া, এরপর ২০১৪/২০১৮/২০২৪-এ শেখ হাসিনা। এর পরিণতি কিন্তু সবাই ভুগেছেন, তবু কেউ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেননি। এখনো একই ধারা চলছে। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা নেই, সবাই আসন ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত।

—**শিতাংশু গুহ**, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ঠিকাকর্মী নিয়োগে নানা অসঙ্গতি

পেট্রাপোল ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া এবং কল্যাণী এইমস কর্তৃপক্ষ ঠিকা চুক্তির ভিত্তিতে যে কর্মী নিয়োগ করেছে সেই নিয়োগ বর্তমানে আতস কাঁচের নীচে। এখানে কর্তৃপক্ষ তাদের মর্জি মতো লোক নিয়োগ করেছে ঠিকাদারের মাধ্যমে। এই কর্মী নিয়োগে কোনোরকম পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। এক কথায় ব্যক্তি উদ্যোগে এইরকম বড়ো দুটি ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগ হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। সব থেকে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের মতো একটি সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠনকে অন্ধকারে রেখে কীভাবে এই ব্যক্তিগত নিয়োগ হলো?

পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ তাঁর অগ্রগতি বৃদ্ধি করবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পেট্রাপোল ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া এবং কল্যাণী এইমস-এর মতো সংস্থায় যেখানে একসঙ্গে একশোরও বেশি নিয়োগ হয়েছে, সেখানে এই দুই জায়গাতে কর্তৃপক্ষকে আতস কাঁচের নীচে রেখে অবিলম্বে সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে আবেদন, অবিলম্বে এই দুই জায়গার ঠিকা চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য। আশা রাখি অতি দ্রুত সিবিআই তদন্ত শুরু হবে এবং প্রকৃত সত্য প্রকাশ পাবে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজ রোড, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

ফ ঃ ৩

সেকুলারিজমের ঘোর কাটতে চলেছে

নারায়ণ শঙ্কর দাস

সেকুলার শব্দটি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ছিল না। সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানের প্রস্তাবনাকে সংবিধানের আত্মা বলেছেন। সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়লে কোনোভাবে প্রস্তাবনায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না, তা-ও তাঁরা বলে গেছেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সুযোগে বিরোধীশূন্য লোকসভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের প্রস্তাবনায় সেকুলার ও সোশ্যালিস্ট শব্দদুটি সংযোজন করেছেন। আরও দুর্ভাগ্য যে দেশের তথাকথিত শিক্ষিত বাঙ্গালিরা সেকুলারের প্রতিশব্দ করেছেন 'ধর্মনিরপেক্ষ', যা একেবারে ভুল।

অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড্ লার্নার্স্ ডিকশনারি সেকুলার' শব্দের অর্থ বোঝাতে লিখেছে, 'ইন দ্য আর্লি ক্রিশ্চিয়ান চার্চ, সেকুলার ওয়াজ ইউজড্ টু ডিসক্রাইব থিংগস্ দ্যাট অয়ার নট রিলিজিয়াস।' আরও লিখেছে, ' অব প্রিস্টস্ ইন অ্যানসেন্ট টাইম, লিভিং অ্যামোং অর্ডিনারি পিপল র‍্যাদার দ্যান রিলিজিয়াস কমিউনিটি।'

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমান বিশ্বে কোনো শাসকশ্রেণীই সেকুলার নয়। ভোট পলিটিক্সের দৌলতে তারা সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু, এমনকী দেশবিরোধী শক্তিকেও তোষণ করে চলেছে। এটাই বাস্তব। কয়েক বছর আগেকার কথা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন ডেমোক্রেটিক পার্টির বারাক হুসেন ওবামা। তিনি তখন ক্যাথলিক জগতের সর্বোচ্চ পোপ ফ্রান্সিসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মার্কিন পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে। অথচ সেকুলারিজমের মূল কথা হলো কোনো সম্প্রদায় বা তাদের উপাসনা পদ্ধতির ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনো রকম সম্পর্ক থাকবে না। সেটা মানলে তো মার্কিন কংগ্রেসে খ্রিস্ট রিলিজিয়নের পোপ ফ্রান্সিসকে আমন্ত্রণ জানানোর কথাই নয়। এতে কি সেকুলারিজম লজ্জিত হয়নি? কিন্তু তা নিয়ে পৃথিবীর কেউ কোনো উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করেনি।

অথচ ভারতে অতি ন্যক্কারজনকভাবে মসজিদের ইমামরা হামেশাই তথাকথিত মেকি সেকুলার রাজনৈতিক দলকে ভোট দেওয়ার ফতোয়া জারি করে। তখন কিন্তু এদেশের সুেক-মাকু- পাকুরা টুঁ শব্দটি করে না। এরা সরব হয় যোগগুরু রামদেব বাবা, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের মতো উচ্চমার্গের সন্ন্যাসীরা রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের প্রশংসা করলে। শুধু তাই নয়, হিন্দুদের পক্ষে কথা বললে সাধু-সন্ন্যাসীকেও কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরা সেকুলারিজমের নামে করে তুষ্টীকরণের রাজনীতি।

ভারত আধ্যাত্মিকতার দেশ। এদেশের প্রকৃতি হলো সর্বপন্থ সমভাব। এখানকার সংস্কৃতি সর্বসমাবেশক। তাই সংবিধান প্রণেতাগণ আলাদাভাবে সেকুলারিজম শব্দটির প্রয়োজন মনে করেননি। এই দেশের রাজা, মহারাজারা কখনো তুষ্টীকরণের রাজনীতি করেননি, করেছেন জনকল্যাণের নীতি। এটাই যেকোনো সভ্য দেশের মানসিকতা হওয়া উচিত। কিন্তু যে সব দেশে গণতন্ত্র, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো নেই, বিশেষ করে ইসলামি দেশগুলি, তারা উন্নত সভ্যতার সন্ধান এখনো পায়নি। অথচ ভারতের তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলি সেকুলারিজমের নামে, ভোটব্যাংকের লোভে দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে এই দেশের মূল স্রোতে মিশতে দেয়নি। সেকুলারিজমের পক্ষধারীরা ভাবের ঘরে চুরি করতে অভ্যস্ত, তাদের এসব কথা বোধগম্য হয় না।

'সেকুলার' এই ইংরেজি শব্দটির অর্থ বুঝতে ইংলিশ ডিকশনারিকেই গুরুত্ব দিতে হবে। যদিও কিছু লোকের স্বার্থ চরিতার্থ করতে আজকাল ইংরেজিতেও এর একাধিক অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। তার অপব্যাখ্যাও করা হচ্ছে। বাঙ্গালি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তো সেকুলার বলতে বোঝেন ধর্মনিরপেক্ষতা। কেউ কেউ অর্থ করেন--- ধর্মহীনতা, ধর্মবিরোধিতা। আবার কেউ কেউ বোঝেন তুষ্টীকরণ। এদের অধিকাংশই করে কেবল হিন্দুধর্মের বিরোধিতা। এই শব্দের অপপ্রয়োগ দেখে বাংলাদেশের প্রাবন্ধিক আবুল ফজল তাঁর 'মানবতন্ত্র' প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'সেকুলারিজমের অর্থ করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা। আসলে এটাও একটা পোশাকি ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতার একটি নতুন নাম।'

পশ্চিমবঙ্গের সেকু-মাকু-পাকুরা বাঙ্গালিকে এই বিকৃত অর্থটিই খাইয়েছে। এতদিন এটিই তারা চর্বিতচর্বণ করেছে। সেকু-মাকুরা তো আব্রাহম লিঙ্কনের 'গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল'-এর অর্থ বুঝতে পারেনি। তারা ডেমোক্রেসিকে হিপোক্রিসিতে পরিণত করেছে। এরা মুখে এক, আর মনে আর এক। রাস্তাঘাটে, মিটিং-মিছিলে ইউরোপ-আমেরিকার বাপবাপান্ত, আর একটু সুযোগ পেলেই সেসব দেশে পা রাখতে পারলেই আটাশ বা ছত্রিশ ইঞ্চি বুক ফুলিয়ে, হাবে ভাবে, চালচলনে পূর্ণ পরিতৃপ্তির বিস্ফোরণ। ইংরেজি বিদ্বেষ সত্ত্বেও এরা আপন সন্তানসন্ততিকে সেন্ট, মেরি, হোলি স্কুলে ভর্তি করিয়ে আপন আপন সুপ্ত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়।

দিন বদলেছে। বাঙ্গালি তাদের চালাকি ধরে ফেলেছে। আর ধরে ফেলেছে বলেই তারা এখন অস্তিত্বহীনতায় ভুগছে। সেকুলাজিমের ঘোর কেটে বাঙ্গালি এখন জেগে উঠেছে। তাই এখন সেকুলারিজম শব্দটিকেই প্রয়োজনহীন বলে মনে করছে। অনেকে এটাকে ভালো বলে স্বীকৃতি দিলেও মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। এটাও কিন্তু এক নিকৃষ্ট মানসিকতার লক্ষণ। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শেষের কবিতা'য় লিখেছেন, 'সংসারে ভালো জিনিস যত কম হয়, ততই মঙ্গল। নইলে ভালো নিজেরই ভিড়ের মাঝে মাঝারি হয়ে যেত।'

□

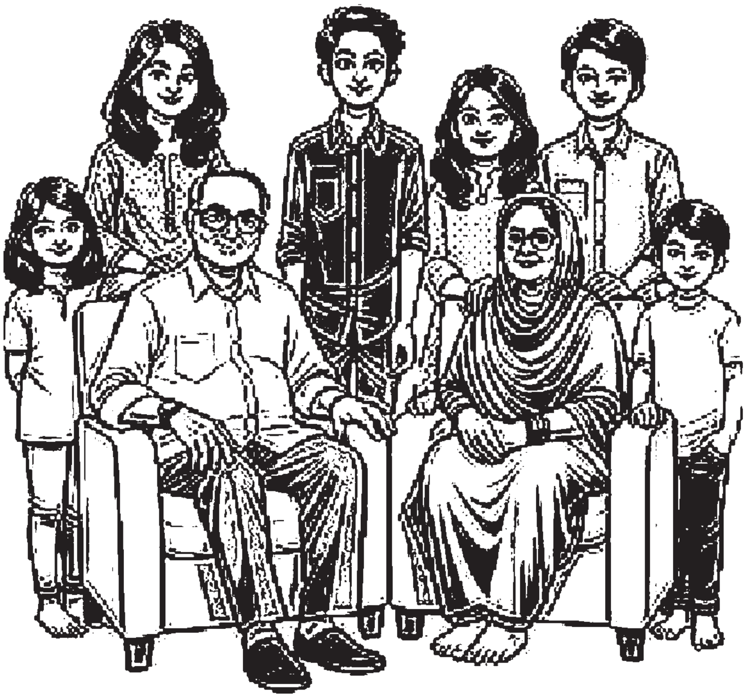

সামূহিক সম্পর্ক রক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

'সম্পর্ক' শব্দটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া একটু কঠিন, অথচ এই ছোট্ট শব্দটির মধ্যে নিহিত আছে আমাদের ছোট্ট গণ্ডি থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব। আমরা ব্যবহারিক জীবনে অনেক সময় বলে ফেলি— না, অমুকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ অমুকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চাইছি। একজন মানুষকে অস্বীকার করতে উদ্যত হয়েছি। আবার অনেক সময় পরিচিত কাউকে বলা হলো যে— অমুকের সঙ্গে দেখা করতে পারেন, আমার পরিচিত, সম্পর্কের মধ্যে আছেন। যিনি ওই মানুষটির কাছে পৌঁছলে সম্পূর্ণ অপরিচিত দু'জন পরিচিত হলেন, সম্পর্কিত হলেন। সম্পর্কের গভীরতায়, আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। সম্পর্কের এই মাধুর্য আমাদের জীবনকে সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ করে তোলে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে সম্পর্কের সূত্রে বাঁধা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে পাই সৌরমণ্ডলের মধ্যে সম্পর্ক। সকল শক্তির উৎস সূর্য শক্তি বিতরণ করে। সেই সূর্যরশ্মির সহায়তায় গাছ, বৃক্ষ-লতাদি আমাদের প্রাণবায়ু (অক্সিজেন), খাদ্য, জল সরবরাহ করছে। ওই সবুজের সম্ভার আমাদের শক্তির উৎস। সেজন্য আমরা কাজ করতে পারছি। জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছি। প্রকৃতিতে দেখতে পাই গাছপালা থেকে পোকামাকড় খাদ্যগ্রহণ করছে। পোকামাকড় খাচ্ছে পাখি, আবার ছোটো ছোটো পশু-পাখি ধরে খাচ্ছে বড়ো বড়ো মাংসাশী প্রাণী। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন :

'অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।" (৩।১৪-১৫)

সুতরাং প্রকৃতিও সম্পর্কের অমোঘ নিয়মে বাঁধা। প্রকৃতির সঙ্গে আরও গভীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমরা বলে থাকি সূর্যিমামা, চাঁদমামা, মহাকাশে নক্ষত্রদের সঙ্গে পরিচিত হই সপ্তর্ষি এবং অন্যান্য মানবিক নামে।

আবার সম্পর্কের স্বরূপ প্রকাশ করে ভগবান গীতায় বলছেন :

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।। (৭।১০)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও দেখতে পাই সম্পর্কের মাহাত্ম্য। পরিবারের মধ্যে অথবা বাইরের সম্পর্কের পরিধি বিস্তৃত হলে। জীবনও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগতে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্কিত। ছোটো প্রস্তরখণ্ডও নারায়ণরূপে, শিবরূপে, শক্তিরূপে পূজিত হয়। বৃক্ষ-লতাদিকে আমরা পূজা করি। জড়ের মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপন করে আমরা তাকে প্রাণময় করে তুলি। সেজন্য ব্যবহারিক জীবনেও আমরা যেন কখনো সম্পর্ক শেষ করার মতো নেতিবাচক কাজে কখনোই প্রবৃত্ত না হই। এ আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সৃষ্টি বিরুদ্ধ। বর্তমানে আমরা আমাদের ছোটো ছোটো পরিবার— নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক তো বজায় রাখবই, এছাড়াও আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, অল্প বা বেশি পরিচিত, ফল-সবজি বিক্রেতা, কাজের মাসি, আমাদের কাজের সহায়ক প্রত্যেকের সঙ্গে সুগভীর সম্পর্ক স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

মহিলারা স্বভাবতই মাতৃহৃদয়া। তাঁরা সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী; সুতরাং তারা সকলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেই চলেন। বর্তমানে ছোটো পরিবারে নতুন প্রজন্মকে যেন ঠাকুরদা-ঠাকুমা, দাদু-দিদা, জেঠু-জেঠি, কাকু-কাকিমা, পিসিমা, মাসিমা, মামা-মাসিমা ইত্যাদি সম্পর্কগুলোকে যথাযোগ্য গুরুত্ব ও সম্মান করতে শেখাই। সম্পর্কের মাধুর্য, গুরুত্বের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মতা সম্ভব। নিজেদের এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে মোবাইল, ল্যাপটপ থেকে একটু দূরত্ব তৈরি করে পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্ব অনেকটাই মহিলাদের এবং তাঁরা এই গুরুদায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত। ■

বর্ষায় ত্বকের সংক্রমণ ও সতর্কতা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

বর্ষাকাল মানে চার পাশে জীবাণুদের বাড়বাড়ন্ত। এই সময় স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ার কারণে জীবাণু শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বাতাসে উড়ে বেড়ায়। ত্বকের সংস্পর্শে এলেই শুরু হয় সংক্রমণ এবং তা বাড়তে থাকে। তাই বর্ষাকালে জরুরি ত্বকের সতর্কতা এবং অতিরিক্ত যত্ন। কয়েকটি ত্বক সংক্রমণ রয়েছে যা বর্ষায় বেড়ে যেতে পারে।

স্ক্যাবিস : স্ক্যাবিস একটি সংক্রামক জলবাহিত রোগ যা পরজীবী মাইট থেকে শরীরে দেখা দেয়। বর্ষাকালে লোকেরা প্রায়ই দূষিত জলের সংস্পর্শে আসে যাতে ত্বকে ফুসকুড়ি হয় এবং তীব্র চুলকানি হতে থাকে। স্ক্যাবিস সংক্রামক এবং এই অ্যালার্জিতে প্রচণ্ড ইরিটেশন বাড়ে। স্ক্যাবিস দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সোরিয়াসিস : সোরিয়াসিস হলো এক ধরনের চর্মরোগ যা মাথার তালু, কলুই, হাঁটুর অংশে পায়ে সংক্রমণ হয়। ত্বকে চুলকানি শুরু হয়, আঁশ ওঠে, ফুসকুড়ি হয় ছোটো ছোটো। বর্ষায় পায়ে কাদা, জল বসে গেলে সোরিয়াসিসের রোগীর পক্ষে বেশ সমস্যার হয়। তাই পা খুব ভালো করে পরিষ্কার রাখতে হবে। বর্ষায় ও শীতে এর প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

একজিমা : একজিমা হলো একটি অসংক্রামক ত্বকের অবস্থা। একজিমার লক্ষণ চুলকানি, লালভাব ও প্রদাহ। ত্বকের প্রভাবিত অংশে ফোস্কা তৈরি হয় সঙ্গে ফাটাভাব দেখা দেয়। বর্ষাকাল এই পরিস্থিতি আরও বেড়ে যেতে পারে।

অ্যাথলিটস ফুট : বর্ষার মরসুমে অনেকের পায়ে চুলকানি, বিবর্ণ বা ফাটা নখ দেখা যায়। অ্যাথলিটস ফুটের কারণে একটি ছত্রাক সংক্রমণ বা সাধারণ স্যাঁৎসেঁতে ঋতুতে নোংরা জলের কারণে ঘটে। ক্যান্ডিডা নামক একটি ছত্রাকের কারণে এই রোগ হয়। পায়ে জ্বালাভাব হয়। ফোস্কা দেখা দেয়। পায়ের আঙুলের মাঝে ফাটা ফাটা আঁশযুক্ত ত্বক দেখা দেয়।

দাদ : বর্ষাকালে সাধারণত বগল, ঘাড় বা পায়ের তলদেশে যে বৃত্তাকার, লাল ছোপ দেখা যায়। দাদ এক ধরনের ছত্রাক সংক্রমণ। একটি বৃত্তাকার ফুসকুড়ি হয়। রোগটি ছোঁয়াচে। মূলত শরীরের নানা ভাঁজে এই ছত্রাক জন্মায়। যেমন, গলা, মুখ, কুঁচকি, মলদ্বার, বুক ও পিঠে এটি বেশি হয়। প্রচণ্ড চুলকানির পাশাপাশি কখনো কখনো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষত তৈরি হয়। অনেক সময় ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হলে এতে পুঁজও হতে পারে।

সেবোরিক ডারমাটাইটিস : বর্ষাকালে এর প্রাদুর্ভাব ব্যাপক। মাথার ত্বক, ভ্রূ, মুখমণ্ডল, নাকের দুই পাশ, বুক ও পিঠের মাঝখানে ছোটো ছোটো দানার মতো দেখা দেয়, যা অনেকটা তৈলাক্ত ও হলুদাভ। প্রচণ্ড চুলকায়। এজন্য চুল পড়া বেড়ে যায়, ত্বকে জ্বালাবোধ ও ফুসকুড়ি দেখা দেয়। মূলত ইস্ট নামে এক ধরনের ছত্রাক এজন্য দায়ী।

খোসপাঁচড়া : সারকোপটিস স্ক্যাবি নামের এক ধরনের পরজীবী ত্বকের বিভিন্ন স্থানে দানা দানা সৃষ্টি করে। এটাই খোসপাঁচড়া। এতে ত্বক ভয়ংকর চুলকোয়। এটা এতটাই ছোঁয়াচে যে একজনের হলে পরিবারের সবাই আক্রান্ত হয়। এ কারণে আক্রান্ত না হলেও পরিবারের সবাইকে একই সঙ্গে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে সময়মতো চিকিৎসা না করালে কিডনিতে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। বর্ষার অপরিচ্ছন্নতায়, নোংরা জলের কারণে, স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ার কারণে খোসপাঁচড়া বাড়ে।

চুলকানি : চুলকানি একটি সংক্রামক রোগ। এক ধরনের পরজীবী মাইটের সংস্পর্শে এসে ত্বকে এই সংক্রমণ ঘটে। পরজীবী ত্বকে বাসা বাঁধে এবং তাতে ডিম পাড়ে, ফলে রোগ বাড়ে। চুলকানিজনিত সংক্রমণ প্রবল হয় বর্ষাকালে। মাথার ত্বকেও এই সময় চুলকানি হয়। এর মূল কারণ বৃষ্টির জল। বৃষ্টির জল দূষিত হয় ফলে এই সমস্যা আসে। বর্ষায় ভেজাভাব, ঘাম-প্যাচপেচে অবস্থা থেকেও ত্বকে এই সমস্যা হয়।

হাজা : হাত-পায়ের আঙুলের খাঁজে এই সংক্রমণ হয়। আর্দ্রতার জন্যই মূলত হয়। জল জমে থাকে, মুছলেও পুরোটা পরিষ্কার হয় না। ঘর গেরস্থালির কাজ করায় মহিলাদের বেশি হয়। তাই এই ধরনের সংক্রমণে নামই হয়ে গিয়েছে 'হাউসওয়াইফ ফাংগাল ডার্মাটাইটিস'। ইমিউনোসাপ্রেসেন্টদেরও ইনফেকশন হতে পারে। যেমন যারা ডায়াবিটিসে আক্রান্ত। এঁদের পায়ের যত্ন খুব ভালোভাবে করা উচিত। নচেৎ পায়ে ফাংগাল ইনফেকশন, সেলুলাইটিস এমনকী গ্যাংগ্রিন হতে পারে।

ছুলি : এটি এক ধরনের ছত্রাকজনিত সংক্রমণ। গরম, ঘাম, আর্দ্রতার কারণে হরমোনের পরিবর্তনের কারণে ছুলি হয়। খুব সহজে সারতে চায় না। ত্বকের বিভিন্ন স্থানে সাদা গোলাকার দাগ হয়ে যায়।

কী করবেন : ● জল ঘাটবেন না। বৃষ্টির জলকাদা পেরিয়ে ভেজা অবস্থার বাইরে থেকে ফিরলে স্নান করে ফেলুন এবং শুকনো করে মুছে ফেলুন। শরীরে কোনো খাঁজযুক্ত অংশ ভেজা না থাকে।

● নারকেল তেলে রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান, তাই ত্বকের যেকোনো রকম সমস্যা হলে নির্ভয়ে এবং নিঃসন্দেহে নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন।

● একটি পেঁয়াজের রস আর আধ চা-চামচ নারকেল তেল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার তুলো দিয়ে মিশ্রণটি ছুলির উপর লাগিয়ে দিন। ৫ মিনিট আলতো করে জায়গাটিতে আঙুল দিয়ে রগড়ান। কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন।

● এই আবহাওয়াতে ত্বকের এক্সফোলিয়েশন জরুরি। কফি, চিনি, ওটসের গুঁড়ো ব্যবহার করে এক্সফোলিয়েট করতে পারেন। রোমকূপ পরিষ্কার থাকলে অনেক সংক্রমণ হবে না।

● স্যাঁৎসেতে ভিজে থাকলে সেই জুতো পরবেন না।

● সংক্রমণে বেশি চুলকানি হলে একটি পাতলা সুতির কাপড়ে কয়েকটি বরফের টুকরো নিয়ে ত্বকের ওই অংশে ১০-১৫ মিনিট ধরে রাখুন। এতে কষ্ট কমবে।

● অ্যালোভেরা বেসড ক্রিম বা এর ভিতর থেকে জেলির মতো অংশ বের করে নিয়েও ত্বকে লাগাতে পারেন।

● যে অংশে চুলকানি রয়েছে সেখানে ফটকিরি ভেজানো জল লাগিয়ে নিন।

● চুলকানিতে কষ্ট হলে কর্পূর ও সরষের তেল লাগিয়ে নিন। এতেই মিলবে আরাম।

● এছাড়াও টি-ট্রি অয়েল লাগিয়ে নিতে পারেন চুলকানির জায়গায়। ◘

সাধু সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত অবসান হোক রাক্ষসরাজের

সুপ্রতিম চক্রবর্তী

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজের অভিভাবক ঋষি, মুনি ও সাধুসন্তরা। যেমন একজন অভিভাবক তার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য দিনরাত এক করে কষ্ট করেন, তেমনই প্রাচীনকাল থেকেই সাধুসন্তরা ব্যক্তিগত সর্বস্ব ত্যাগ করে সকলের কল্যাণের জন্য কঠিন তপস্যা ও যজ্ঞের ব্রত নিয়ে নিজেদের সমগ্র জীবন কাটিয়ে দেন। কেন করেন তাঁরা এই তপস্যা? এতো ত্যাগই-বা কেন করেন? আমরা তো সামান্য প্রিয় মিষ্টি খাওয়ার লোভও ছাড়তে পারি না অথচ তাঁরা নিজের সর্বস্ব ভোগ ছেড়ে দিয়ে ত্যাগের পথ গ্রহণ করেন— 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা'। তাঁরা এই ত্যাগ করেন কি শুধু আত্মোন্নতির জন্য! না, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' অর্থাৎ নিজের মোক্ষলাভের জন্যই শুধু এই ত্যাগ ও তপস্যা তাঁরা করেন না, সমগ্র জগতের হিতকামনাও এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে আছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ঋষি-মুনিরা 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সংকল্প নিয়ে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের কামনায় কঠিন তপস্যার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করেন।

রামায়ণ কালেও আমরা দেখেছি ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে যখন যজ্ঞের ব্রত নিলেন তখন মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষস এবং তাদের অনুচররা তাঁর যজ্ঞমণ্ডপে দূষিত বস্তু ফেলে যজ্ঞ ধ্বংস করে দিত। তেমনই বর্তমানে যেসমস্ত সাধুসন্ত নিজের সংসার আদি ত্যাগ করে সমাজের কল্যাণের জন্য কর্মযজ্ঞ করে চলেছেন; বর্তমান যুগের রাজনীতির রাক্ষসেরা তাঁদের পবিত্র কর্মযজ্ঞকে দূষিত করার অভিসন্ধি নিয়ে নানারকমের দুর্বুদ্ধির প্রয়োগ করছে। কিন্তু তারা এটা বার বার ভুলে যাচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করে গেছেন, 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।' অর্থাৎ, যখন যখন ধর্মে গ্লানি আসে তখন তখনই অধর্মকে নাশ করার জন্য আমি অবতার গ্রহণ করি। তারপর বলছেন, 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।' অর্থাৎ, সাধুব্যক্তিদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতীদের বিনাশ এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন করার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

পাপীদের পাপের ঘড়া যখন হয় পূর্ণ, ধর্ম যখন হয় গ্লানিতে আচ্ছন্ন, তখন ভগবান অবতার রূপে সমাজের মাঝে প্রকট হয়ে নিজের ভক্তদের মাধ্যমে পুনরায় ধর্মসংস্থাপন করেন। যুগে যুগে, কল্পে কল্পে তাই ঘটে চলেছে। কলিযুগের প্রভাবে অনেক নিত্যনতুন ধর্মবিরোধী প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে যেমন সেকুলার, মার্কসবাদী ইত্যাদি। এরা অনবরত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। ভারতের সাধুসন্তদের তারা অপমান করছে, মনীষীদের বিরুদ্ধে চালাচ্ছে নানা অপপ্রচার। কেউ কেউ শিক্ষকরূপে ছাত্রদের ধর্মবিরোধী শিক্ষা দেয়, আবার কেউ চলচ্চিত্রনির্মাতা হয়ে সিনেমার মাধ্যমে নিরন্তর হিন্দুধর্মকে অসম্মান করে চলেছে। এমনকী বিশ্ববিখ্যাত অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালকরাও নিজেদের সিনেমায় সাধুদের ভণ্ড, লোভী ও চরিত্রহীনরূপে পরিবেশন করেন। সিনেমার মাধ্যমেই শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সকলের মনে সাধুসন্তবিরোধী ও হিন্দুত্ববিরোধী এক বিষাক্ত ভাবধারার বীজবপন করা হচ্ছে।

তাদের তো কখনো অন্যান্য উপাসনা পদ্ধতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে বা সিনেমা তৈরি করতে দেখা যায় না। তাহলে কেন হিন্দুধর্মের প্রতি এরা নিরন্তর আঘাত হেনে চলেছে, কেনই-বা প্রতিনিয়ত সাধুসন্তদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যাচ্ছে? এর কারণ যদি খতিয়ে দেখা যায় তাহলে জানা যাবে এরা একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য এরা সবাই একজোট। শ্রীরামচরিতমানসে গোস্বামী তুলসীদাস লিখেছেন, 'সন্ত অবজ্ঞা করু ফল ইইসা, জরৈ নগর অনাথ কর জেসা।' অর্থাৎ সাধুসন্তের অপমান করা হলে সেই রাজ্যের কখনো কল্যাণ হয় না বরং ক্ষতি হয়। যেমন চাণক্যকে অপমান করার জন্য ধননন্দের গর্ব ধুলোয় মিশে গেছিল; তার রাজ্য সে হারিয়েছিল। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে অসুর, রাক্ষস এবং মনুষ্যরূপী অধার্মিক, পাপীদের সংহার করে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করেছেন। পরম করুণাময় ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা যে পশ্চিমবঙ্গেও খুব শীঘ্রই যেন রাক্ষসদের বিনাশ হয়ে ধর্মরাজ্য তথা রামরাজ্য স্থাপিত হয়। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর উদ্ধারণের পর শ্রীভগবান যেন কলি উদ্ধারণে অবতীর্ণ হন। তাঁর পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসী।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ এবং শাসকদলের হিন্দুদ্বেষী চক্রান্ত

ড. বিনয়ভূষণ দাশ

মুর্শিদাবাদের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙ্গা আশ্রমের প্রধান স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজকে (সাধারণ্যে কার্তিক মহারাজ বলে পরিচিত) নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে ঘিরে উত্তপ্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি। কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে রাজনীতি যোগের অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, কার্তিক মহারাজ নাকি বেলডাঙ্গা তথা মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কিছু বুথে তৃণমূল কংগ্রেস দলের এজেন্টদের বসতে দেননি। সম্প্রতি বাঁকুড়ার এক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, কার্তিক মহারাজ নাকি 'এলাকায় গিয়ে ধর্মের নামে বিজেপির প্রচার করে বেড়ান। আমি বলছি, আপনি করুন। কিন্তু বিজেপির চিহ্নটা বুকে লাগিয়ে করুন। ধর্মের নামে কেন, লুকিয়ে লুকিয়ে কেন?' তাঁর মতে, কার্তিক মহারাজ নাকি বিজেপির হয়ে কাজ করছেন! মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কার্তিক মহারাজ পালটা আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর আঁতে ঘা লেগেছে।

দেখা যাচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার হিন্দু সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। রাজ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তথা সঙ্ঘের বেলডাঙ্গা আশ্রমের প্রধান স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজের বিরুদ্ধে যেন আদাজল খেয়ে লেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর তৃণমূল কংগ্রেস। কার্তিক মহারাজ দীর্ঘদিন থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত দরিদ্র-নিপীড়িত মানুষের সেবায় নিয়োজিত। তিনি জেলায় দরিদ্রদের জন্য বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন ধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য। জেলায় তিনি খুব জনপ্রিয় হিন্দু সন্ন্যাসী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ চিন্তিত থাকবেন। এক্ষেত্রে তিনি দল বিশেষের প্রতি অনুরক্ত থেকেছেন একথা কোনো নিরপেক্ষ মানুষ বলতে পারবে না। হিন্দু স্বার্থের অনুকূল যে কোনো দল বা সংগঠনকেই তিনি উদারহস্তে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তাঁর সেবাকার্য ধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য।

মুর্শিদাবাদ জেলা গত একশো বছরের বেশি সময় ধরে মুসলমান প্রধান। এই জেলায় হিন্দুরাই দৃষ্টিকটুভাবে সংখ্যালঘু। দীর্ঘদিন জেলাটি মুসলমান নবাবদের শাসনে থাকার ফলে জেলার মুসলমান সম্প্রদায় স্বজাতীয় মুসলমান শাসকদের আনুকূল্য পেয়েছেন সর্বতোভাবে। আর জেলার সংখ্যালঘু হিন্দুরা থেকেছেন দুয়োরানির মতো। তাঁদের সংখ্যা ক্রমাগত কমেছে, অন্যদিকে, তথাকথিত মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে গাণিতিক হারে। হিন্দুরা একসময় নবাবদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন; আর এখন তাঁরা জেলার সংখ্যাগুরু মুসলমানদের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস প্রশাসনের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে এই অত্যাচার এখন বহুগুণ বেড়ে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবির, প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবির, মেহেবুব আলম, আমিরুল ইসলাম, হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখ ইত্যাদি হিন্দুবিদ্বেষী নেতারা দলবদ্ধভাবে মাঠে নেমে পড়েছে। ফলে হিন্দু সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। তিনি হিন্দুদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। এর আগে তিনি জেলার কিছু অংশে ওয়াকফ আইন বিরোধী ইসলামি তাণ্ডব ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে অভিযোগ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন। আর এসব কারণেই ভীষণ চটে গিয়েছেন মুসলমানস্বার্থের স্বয়ম্ভু রক্ষক তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কার্তিক মহারাজকে উচিত শিক্ষা দিতে মাঠে নেমে পড়েছেন।

আর মুখ্যমন্ত্রী নিজের স্বার্থের জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা করতে পারেন না। তিনি একদিকে কাঠমোল্লাদের তোল্লা দিয়ে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে হিন্দু সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে যা খুশি অভিযোগ করছেন। এমনকী তিনি এজন্য সন্ন্যাসীদের চরিত্রহননেও পিছপাও নন। তিনি যথারীতি কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে চরিত্রহননে নেমে পড়েছেন। আমরা মুর্শিদাবাদবাসী কার্তিক মহারাজকে খুব ভালো করেই জানি। তিনি জেলায় হিন্দু স্বার্থের রক্ষক। মুসলমান তোষণরত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার এক মহিলাকে দিয়ে কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে চরিত্র হননের অভিযোগ আনিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানায় এই অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি ২০১৩ সালে নবগ্রাম থানার চানক গ্রামের এক স্কুলে ওই মহিলাকে চাকরি দিয়ে সংশ্লিষ্ট মহিলার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে দিনের পর দিন গর্হিত কাজ করেছেন। অভিযোগকারিণী বহরমপুরের এক সম্ভ্রান্ত, প্রতিপত্তিসম্পন্ন পরিবারের গৃহবধূ। অভিযোগ করা হয়েছে, ওই মহিলাকে একটি স্কুলে চাকরি দেন কার্তিক মহারাজ। ওই স্কুল আবাসনেরই পঞ্চম তলায় থাকতে দেওয়া হয় তাকে। তারপরে নাকি মহিলাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাকে নাকি বলা হয়, মাসে মাসে বেতন পৌঁছে যাবে বাড়িতে। অভিযোগ করা হয়েছে, এই প্রতিশ্রুতিও নাকি রক্ষা করেননি কার্তিক মহারাজ। ওই মহিলা তার অভিযোগে বলেছেন, ২০১৯ সাল অবধি নাকি তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছেন কার্তিক মহারাজ।

মজার ব্যাপার হলো, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার পরে পরেই এই অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা।

এখন প্রশ্ন হলো, এই মহিলা এত বছর পরে কেন অভিযোগ করলেন? তিনি তো সাধারণ পরিবারের গৃহবধূ নন, বহরমপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা মহিলা। তাঁর তো ভয় পাওয়ার কথা নয়। অথচ তখন তিনি কোনো অভিযোগ করেননি। তখন তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই বর্তমান ছিল। অভিযোগ সত্য হলে তাঁর মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা অবশ্যই আগেই অভিযোগ করতেন।

আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের জেহাদি সদস্যদের জেলা জুড়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি প্রতিবাদ করে গিয়েছেন সর্বদা। একসময়, ২০১৩ সালের উপ-নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের রেজিনগরের বর্তমান (সেই সময়) বিধায়ক, চরম হিন্দুবিদ্বেষী হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরীর সমর্থনে অধীররঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে প্রচার করেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল হিন্দুদের পক্ষে রবিউল আলম চৌধুরী lesser evil, কম ক্ষতিকারক। অর্থাৎ তিনি যেখানে মনে করেছেন হিন্দু স্বার্থ জড়িত সেখানেই অংশগ্রহণ করেছেন দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে। সাম্প্রাতিককালে হিন্দু স্বার্থে তাঁর কাজ করাকে মুসলমান তোষণবাদী মুখ্যমন্ত্রীর আর সহ্য হচ্ছে না। ফলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কার্তিক মহারাজকে বিজেপির সঙ্গে জুড়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করছেন না।

হুমায়ুন কবিরের তথাকথিত ক্যারিশ্মা মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দুরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করে। যদিও, এখন অধীর চৌধুরী কার্তিক মহারাজের বিরোধিতা করছেন। আর মনে রাখতে হবে, হুমায়ুন কবীর, নিয়মিত শেখ, রবিউল আলম চৌধুরী এঁরা সব আদতে অধীররঞ্জন চৌধুরীর সাগরেদ ছিল, এখন সবাই তৃণমূল কংগ্রেসে। রেজিনগর বিধানসভা অঞ্চলের সংখ্যালঘু হিন্দুরা হুমায়ুনের হিন্দুবিদ্বেষী ভূমিকার কথা বেশ ভালো করেই জানে। আর এই হুমায়ুন কবীরই সম্প্রতি বলেছে, জেলার ৩০ শতাংশ হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেবে। এরপরও

কে এই কার্তিক মহারাজ বা স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী? বেলডাঙ্গা তথা মুর্শিদাবাদ জেলায় কী তাঁর অবদান?

কার্তিক মহারাজ খুব কিশোর বয়সেই যোগ দিয়েছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পুরুলিয়া আশ্রমে। তারপরে সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ঔরঙ্গাবাদ আশ্রমে। সেখানে তিনি স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষা নেন। এরপরে তিনি ব্রহ্মচারী হন। ব্রহ্মচারী হওয়ার পরে তিনি বেলডাঙ্গায় চলে আসেন। সেখানে তখন কোনো আশ্রম ছিল না। তিনি ভিক্ষা করে সেই অর্থ দিয়ে দুটি টিনের চালা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিলেন। তারপরে একটা মন্দির। সেটা আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগের কথা। প্রতিষ্ঠা করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙ্গা শাখা। বেলডাঙ্গায় আসার পরে তিনি জনজাতি মেয়েদের জন্য একটা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দু স্বার্থরক্ষার্থে 'হিন্দু মিলন মন্দির'। এই সময় থেকে তিনি সরকারি সহায়তাও পেতে শুরু করেন। বর্তমানে বেলডাঙ্গায় প্রায় বারোটি বিদ্যালয় রয়েছে আশ্রমের তত্ত্বাবধানে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। প্রায় ৪৫০ জন জনজাতি ছাত্র ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করে। এছাড়া তিনি বেলডাঙ্গায় একটি হাসপাতাল স্থাপন করেছেন। খালি হাতে বেলডাঙ্গায় এসে তিনি ভিক্ষা করেই এসব করেছেন।

কিন্তু তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুমায়ুনের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস করেনি। আরেক হুমায়ুন কবির, জেলার প্রাক্তন এসপি, মুর্শিদাবাদের কান্দির হিজল অঞ্চল নিয়ে লেখা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক উপন্যাসে 'লাভ জেহাদের' পক্ষে প্রচার করেছেন, সেই উপন্যাসে এক হিন্দু মেয়েকে তাঁদের খালি বাড়িতে ধর্ষণ পর্যন্ত করিয়েছেন। ইনি আবার এখন মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থেকে নির্বাচিত একজন তৃণমূল বিধায়ক যিনি সম্প্রতি তৃণমূলিদের হাতে নিহত তামান্না খাতুনের পরিবারকে ঘুষ দিতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

মূল কথা হলো, কার্তিক মহারাজ জেলার হিন্দুদের পক্ষে কথা বলছেন, তাঁদের সাহস জোগাচ্ছেন। আর তাতেই মমতা ব্যানার্জির ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। কারণ জেলায় জেলায় মুসলমানরাই হলো মমতার নির্বাচন জয়ের তুরুপের তাস; তাই তাঁর দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। কেউ বললেই সে হয়ে যাবে মমতার 'চোখের বালি'। আর হিন্দু সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ হিন্দুদের কথা বলেছেন, তাঁদের সাহস জোগাচ্ছেন, অতএব তাঁকে কিছুতেই রেয়াত করা যাবে না। সুতরাং হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধার মানুষ, হিন্দু সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে এই ব্যাভিচারের অভিযোগ আনা যাতে মুসলমান সমাজ সন্তুষ্ট থাকে, আর সকলে হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি বিরূপ থাকে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহস নেই, মুসলমান সন্ত্রাসবাদী, বিভিন্ন হিন্দুবিরোধী দাঙ্গায় অংশ নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন মুসলমান নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়াতে। ফলে রাজ্য জুড়ে শাজাহান, আরাবুল, হুমায়ুন, নিয়ামত, আমিরুল ইসলামদের ছড়াছড়ি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এইসব দুষ্কৃতীদের দেখেও না দেখার ভান করছেন। তাঁর সব কোপ বা রোষ গিয়ে পড়েছে হিন্দু সন্ন্যাসীদের উপর।

স্বাভাবিকভাবেই কার্তিক মহারাজ তথা স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ ওঠায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। এমনকী পশ্চিমবঙ্গে এসে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তাঁর বিরুদ্ধে উঠা এই অভিযোগের তীব্র নিন্দা করেছেন। সম্প্রতি হাইকোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগের কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি রাজ্য সরকার, তাই রাজ্য সরকার সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড়ের জন্য আরও সময় চেয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্য সরকার মিথ্যে অভিযোগ আনিয়েছে ওই মহিলাকে দিয়ে।

কিন্তু কোর্টে প্রমাণিত হলো, কার্তিক মহারাজের মিথ্যে মামলা করা হয়েছে। অভিযোগকারী মহিলা এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন, তাঁকে দিয়ে কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে মামলা করানোতে হাত রয়েছে আইপ্যাক এবং কলকাতার বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতার। সম্প্রতি মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ তথা কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানি ছিল। সেখানে রাজ্য সরকারের তরফে বলা হয়েছে, তারা নাকি এখনো মামলার কাগজপত্র পড়েই উঠতে পারেনি। তাই তারা আরও সময় চেয়েছে। রাজ্য সরকারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সময় দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছে, মামলার শুনানি শেষ না হওয়া অবধি কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না। কিন্তু এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে যায়, স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ এবং হিন্দু সমাজকে দুর্নাম করাটাই ছিল তৃণমূল দল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। তবে এসব করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর পার পাবেন না। হিন্দুসমাজ তার যোগ্য জবাব দেবে।

পরিশেষে বলা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় রাজ্যের হিন্দু জনগণের মন বুঝতে ভুল করছেন। নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ বিধানসভার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে ঠিকই, কিন্তু সেখানকার হিন্দু ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (৭০ শতাংশ) তৃণমূল নয়, সমর্থন করেছে বিজেপিকে। আগামীদিনে রাজ্যে এই 'মডেল'ই ক্রিয়াশীল হবে বলে মনে করা যায়। আগামীদিনের জন্য এটা যেমন হিন্দু জাগরণের এক রুপালি রেখা, তেমনই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এক অশনি সংকেত।

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৯ জুন বাগবাজারে গৌড়ীয় মঠের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা। মঞ্চাসীন ছিলেন সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সঞ্জয় চৌধরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. আশিস গিরি। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য, মার্গদর্শক জয়ন্ত পাল এবং সম্পর্ক অধিকারী বিপ্লব রায়। মঞ্চাসীন অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান এবং ভাবসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। সভার প্রথম সত্রে ১২টি জেলা থেকে আগত জেলা সম্পাদকরা তাঁদের জেলার বিগত বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ এবং আগামী কার্যক্রমের রূপরেখা বর্ণনা করেন। আসানসোল ও বাঁকুড়া জেলার প্রতিনিধিরা ঘোষণা করেন তাঁরা আগামীদিনে নিজ নিজ জেলায় সংস্কার ভারতীর কাজ শুরু করবেন। সহ সম্পাদক অমিত দে বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এরপর সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন, বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু। দুটিই সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

দ্বিতীয় সত্রের প্রথমে বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর গ্রামের কর্মকার পাড়ার রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ভোলানাথ কর্মকার এবং তাঁর পরিবারের সের-পাই শিল্পের উপর নির্মিত এক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর সভায় দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথমটি— হাস্যরসাত্মক শিল্পকলা সৃষ্টিতে ভারতীয় মূল্যবোধের চেতনা পুনর্স্থাপন অপরিহার্য। এই বিষয়ে সংস্কার ভারতীর কার্যকরী সমিতি বিশেষ চিন্তা ব্যক্ত করে নাট্যবিধার সঙ্গে যুক্ত সকল শিল্পী, দর্শক, প্রশাসন, নীতি নির্ধারকদের প্রতি আবেদন জানায় এই বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য এবং গ্রামবাঙ্গলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালাকে বাঁচিয়ে রাখতে যাত্রাশিল্পীদের স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদানের দাবি পেশ। দ্বিতীয়টি— সংগঠনের বিস্তার। বন্দেমাতরম সংগীতের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তার তাৎপর্য প্রচারের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য সারা বছরের কর্মসূচি পালন করা।

এরপর সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত ২০২৫-২০২৬ বছরের কার্যকরী সমিতির নাম ঘোষণা করেন। তারপর প্রশান্ত ভট্ট, ড. আশিস গিরি এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদক সঞ্জয় চৌধুরীর ভাষণ শেষে বন্দেমাতরম সংগীতের পর সভা সমাপ্তি হয়।

ফ ঃ ৪

ভারতসভা হলে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ৬ জুলাই, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি'র উদ্যোগে মধ্য কলকাতা-স্থিত ঐতিহাসিক ভারতসভা হলে উদ্‌যাপিত হয় ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মদিবস। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এদিন বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণের অনুষ্ঠানটির নাম ছিল— '১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে বাঙ্গালির মননে শ্যামাপ্রসাদ'। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতির সভাপতি, প্রবীণ রাজনীতিবিদ তথা পূর্বতন সাংসদ শিশির অধিকারী, সমিতির কার্যকরী সভাপতি প্রবীণ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ও বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের নির্দেশক ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক ও লেখক ডাঃ মধুসূদন পাল এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজী মাসুম আখতার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের হাতে এদিন বিশিষ্ট লেখক সন্দীপ মুখোপাধ্যায় রচিত 'অচেনা-অজানা ড. শ্যামাপ্রসাদ (১৯৩৫-১৯৫৩)' বইটির প্রচ্ছদ উন্মোচিত হয়। বইটির প্রকাশক হলো ভারত ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন।

বাঙ্গলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাজীবন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য হিসেবে তাঁর কর্মজীবন, রাজনৈতিক জীবনে তাঁর প্রবেশ, যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদে বাঙ্গালি হিন্দুর রক্ষাকর্তা রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ, শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা গঠন, পূর্ব পাকিস্তান বিভাজনের মাধ্যমে 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর রূপদান, স্বাধীন ভারতে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন, সংবিধানের ৩৭০ ধারার বিরোধিতা করে কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি এবং দেশে 'এক নিশান-এক বিধান-এক প্রধান'-এর দাবিতে অটল থেকে তাঁর আত্মবলিদানের ইতিহাস বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন প্রবীণ আইনজীবী অজয় নন্দী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদের অসাধারণ অবদান, পাকিস্তানের দাবি উত্থাপনের প্রেক্ষিতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শ্যামাপ্রসাদের পক্ষ থেকে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ডের পরিকল্পনা, জেহাদি আক্রমণে বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে গিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সাহায্যে তাঁর জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পরাবর্তনের বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেন ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ড. শ্যামাপ্রসাদ ভিন্নধর্মী মেরুর ব্যক্তি বলে দাবি করে তাঁদের মধ্যে বিভাজন রেখা অঙ্কনের লক্ষ্যে সামাজিক মাধ্যমে নানা মিথ্যে প্রচার করে থাকে বামপন্থীরা। সেই অপপ্রচারকে এদিন তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে খণ্ডন করেন ডাঃ মধুসূদন পাল। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে একাধিক উদাহরণ তুলে ধরে তিনি প্রমাণ করেন যে, সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ— দু'জনেই ছিলেন প্রখর জাতীয়তাবোধসম্পন্ন এবং তাঁদের মধ্যে কোনো আদর্শগত বিভাজন ছিল না। তিনি বলেন যে, ১৯৪৩ সালে ২১ অক্টোবর, কালীপূজার দিন ভারতের জাতীয় সরকার গঠন করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সেই দিনটিকে স্মরণে রেখে ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে বামপন্থীরা। অথচ কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুর্দিনে তাঁর প্রতি সবরকম সহযোগিতার হাত

বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তাঁকে করেছিলেন আর্থিক সাহায্য। কবি নজরুল বাক্‌শক্তিহীন হয়ে পড়লে মধুপুরের বাগানবাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। করেছিলেন কবির জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা। কবির সহযোগী কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আহমেদ বা অন্য কমিউনিস্টরা কেউ সেদিন কবির সাহায্যে এগিয়ে আসেননি।

বক্তব্য রাখার সময় পদ্মশ্রী কাজী মাসুম আখতার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। যিনি 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টি করলেন, ভারত বিভাজনের পরবর্তী পর্যায়ে বাঙ্গালি হিন্দুর মাথা গোঁজার একটি আশ্রয়স্থল গড়ে তুললেন, তাঁকে অপমান-অসম্মান আর কতদিন করা হবে বলে তিনি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অবদান কী করে বাঙ্গালি ভুলে গেল সেই বিষয়েও তিনি বিস্ময়প্রকাশ করেন। তাঁর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ধুমধাম সহকারে উদ্‌যাপিত হোক, সকল পশ্চিমবঙ্গবাসী তাঁর স্মৃতিচারণ করুক, তাঁর অবদান স্মরণ করুক— এই আশা তিনি ব্যক্ত করেন। সমবেত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' গানের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে। এদিনের সভা সঞ্চালনা করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক প্রবীর ভট্টাচার্য।

সাঁইথিয়ায় শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার প্রখ্যাত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে গত ৬ জুলাই সাঁইথিয়া নিবাসী ভারতীয় রেলের অবসরপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তথা বিশিষ্ট সমাজসেবক ৮৩ বছর বয়স্ক নীরদবরণ ঘোষকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন সাঁইথিয়া টাউন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনবার ব্রহ্মনাদ করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে মাল্যদান করেন শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীগীতা, ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করেন সংস্থার অনুভবী মিনতি দাস এবং সম্পাদক দামোদর ঘোষাল। মিষ্টি প্রদান করে আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন ডাকবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সুপারিন্টেডেন্ট আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধা জানিয়ে সংস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা চৈতালী মিশ্র। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতা জানান ইন্দ্রজিৎ দাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

শিলিগুড়িতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাতৃশক্তি বর্গ

গত ৪-৬ জুলাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তরবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে মাতৃশক্তি বর্গের আয়োজন করা হয় শিলিগুড়ি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয় ভারতমাতা মন্দিরে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৫ জন শিক্ষার্থী, ৪ জন শিক্ষক এবং ১২ জন প্রবন্ধক অংশগ্রহণ করেন। বর্গে উপস্থিত থেকে পথনির্দেশ করে কেন্দ্রীয় সহ মন্ত্রী তথা সহ সেবা প্রমুখ স্বপন মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রীয় মাতৃশক্তি সংযোজিকা ঝর্ণা জানা, ক্ষেত্রীয় দুর্গাবাহিনী সংযোজিকা শ্রীমতী ঋতু সিংহ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ সভানেত্রী শ্রীমতী বিভা সরকার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত মাতৃশক্তি সংযোজিকা শ্রীমতী সোমা দে এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্ত দুর্গাবাহিনী সংযোজিকা শ্রীমতী সরস্বতী রাজগর। ৬ জুলাই বর্গের সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা তথা পদ্মভূষণে ভূষিতা সাধ্বী ঋতম্ভরা। তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে গৌরবমণ্ডিত করে।

INTO YOUR LIFE
SURYA
INTO YOUR LIFE, WE BRING LIGHT, WARMTH, & STRENGTH.
INTO YOUR LIFE, WE BRING SURYA ROSHNI.
Surya Roshni is the trusted companion bringing light, warmth, and care to every moment.
From purity in every sip to safe spaces, we bring innovation and reliability into your life.
Let's brighten up your world together!
Consumer Lighting | Steel & PVC Pipes | Fans | Appliances | Professional Lighting
I am SURYA
50 YEARS OF TRUST
DURABLE PRODUCTS
ASSURED QUALITY
SURYA ROSHNI LIMITED | www.surya.co.in | surya surya_roshni surya.roshni surya-roshni
Email: info@surya.in Tel.: +91-11-47108000

ত্রিপুরার সামাজিক মিলনমেলা খার্চি পূজা

অপু সাহা

ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলির মধ্যে খার্চি পূজা অন্যতম। প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথিতে নির্ঘণ্ট অনুযায়ী চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে খার্চি পূজা হয়ে থাকে। সাতদিনব্যাপী উদ্‌যাপিত হয় এই উৎসব। খার্চি মূলত ত্রিপুরার রাজ পরিবারের কুলদেবতা। সময়ের প্রবহমানকালে বর্তমানে এই উৎসব সকল মত-পথ, সংস্কৃতি, জাতি, জনজাতিদের মাঝে মিলন মেলাতে পরিণত। এই উৎসবে রাজ্য এবং অন্যরাজ্য থেকে সাধু-সন্ত, পুণ্যার্থী, দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। রাজমালা থেকে জানা যায়, আগে এই উৎসব উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু রাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য রাজধানী উদয়পুর থেকে বর্তমানে খয়েরপুর অঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন। যা পুরাতন হাভেলি নামে পরিচিত। এখানেও রাজা গড়ে তোলেন চতুর্দশ দেবতার মন্দির। ১৭৬০ সাল থেকে রাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য পুরাতন হাভেলিতে খার্চি পূজার সূচনা করেন। এ বছর খার্চি পূজা ২৬৫তম বছরে পদার্পণ করেছে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে রাজধানীর পরিবর্তন হয় কিন্তু চতুর্দশ দেবতার মন্দির খয়েরপুরে থেকে যায়। বর্তমানে উদয়পুরে চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই। এই মন্দিরটি প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর এক নিদর্শন।

'খার' শব্দটির অর্থ পাপ এবং 'চি' শব্দের অর্থ মোচন। রাজামালায় উল্লেখিত আছে, ত্রিপুরার মহারাজ ত্রিপুর-পত্নী মহারানি হীরাবতী চতুর্দশ দেবতার দর্শন পান। হীরাবতী চোদ্দদেবতার জন্য দৈনন্দিন ভোগ, নৈবিদ্য ও বলি সহকারে পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে এই পূজার প্রচলন।

সাতদিনব্যাপী এই পূজার শুরুতে চোদ্দ দেবতার হাওড়া নদীতে স্নান করিয়ে মন্দিরে আনা হয়। স্নান পর্ব শেষে মন্দিরে যাবার পথে মাদল বাজিয়ে, পাতায় ছায়াদান করে শোভাযাত্রা সহকারে পুরোহিত ও সহ-পুরোহিতরা মন্দিরের বেদীতে দেবতাদের বসিয়ে থাকেন। পুরোহিতকে বলা হয় 'চন্তাই' এবং সহ-পুরোহিতদের বলা হয় 'দেওয়াই'। রাজ আমল থেকে রাজ সৈন্যরা দেবতাদের 'গার্ড অফ অনার' জানাতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরা পুলিশ দেবতাদের 'গার্ড অফ অনার' জানায়।

চতুর্দশ দেবতা হলেন লাংমা লাংমা (শিব), লাংকুই (বিষ্ণু), বার্মা (ব্রহ্মা), তুইরুং (দুর্গা), সাইব্রা (লক্ষ্মী), সান্দ্রা (সরস্বতী), নাখাই (কার্তিক), হোলাই (গণেশ), হাদ্রা (অগ্নি), মাংখি (বায়ু), চান্তাই (চন্দ্র), হামতাই (সূর্য), রাইথোং (ইন্দ্র), নোইসাং (বরুণ)। শিব, উমা ও হরি প্রতিদিন পূজিত হন। কিন্তু এই পুণ্য তিথিতে চতুর্দশ দেবতা একত্রে পূজিত হন। চোদ্দ দেবতার মস্তক মূর্তি পূজিত হয়। এই দেবতারা ত্রিপুরা রাজ্যের রক্ষাকর্তা ও অভিভাবকস্বরূপ।

১৯৪৮ সাল থেকে পূজা ও মেলার দায়িত্বভার রাজ্য সরকারের। প্রতি বছর শত শত ব্যবসায়ী তাদের পসরা নিয়ে বসেন। প্রতিটি দোকানের ভিটি লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এবছর সফটওয়ারে সব আবেদন অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কৃষ্ণমালা মঞ্চে প্রজেক্টারের মাধ্যমে দোকান ভিটি বিলি করা হয়। রাজ্য সরকার ২০১৮ সাল থেকে উৎসবে আগত সাধুসন্তদের জন্য প্রতিদিন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া ও বিশ্রামের সুব্যবস্থা করে আসছে। এ বছরের থিম 'অপারেশন সিঁদুর'। রাজ্য পর্যটন দপ্তর থেকে মন্দির ও মন্দিরের প্রাঙ্গণ উন্নয়নের জন্য প্রায় ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

খার্চি উৎসব কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি বিশাল সামাজিক মিলনমেলা। এই পূজাকে ঘিরে সাতদিনব্যাপী এক বৃহৎ মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অসংখ্য মানুষ অংশ নেন। মেলায় স্থানীয় হস্তশিল্প, বস্ত্র, মাটি ও কাঠের তৈরি খেলনা, খাবারদাবার, গৃহস্থালির সামগ্রী, কৃষিপণ্য ইত্যাদির বিশাল বিপণন চলে। বিকাল থেকে গভীর রাত অবধি চলে লোকনৃত্য, সংগীত, নাটক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। রাজা ত্রিপুরের আমল থেকেই এই পূজায় রাজপরিবারের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল। আজও রাজপরিবারের প্রতিনিধি ও সদস্যরা এই পূজায় অংশগ্রহণ করে থাকেন, যা রাজসভার ঐতিহ্যকে জাগ্রত রাখে। ত্রিপুরার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

অভ্যন্তরীণ সম্প্রীতির এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রাজ্য সরকার ও পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে খার্চি উৎসব আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করছে। রাজা ত্রিপুর প্রবর্তিত খার্চি পূজা ত্রিপুরার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মীয় সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক চেতনার বহমান ধারা। চতুর্দশ দেবতার পূজার মাধ্যমে জনমানসে ভক্তি, বিশ্বাস ও ঐক্যের যে জাগরণ ঘটে, তা যুগের পর যুগ ধরে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বহন করে চলেছে। □

ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা ভারতমাতা

ধর্মানন্দ দেব

ভারতের সংবিধান প্রণীত হওয়ার বহু আগেই ভারতমাতা এই ভূখণ্ডের আত্মা ও চেতনায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি নন, বরং যুগ যুগ ধরে জাতীয় কল্পনার গভীরে এক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মাতৃমূর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি কেরালার একটি সরকারি অনুষ্ঠানে ভারতমাতার প্রতিচ্ছবিকে ঘিরে বিতর্ক সেই পুরনো প্রশ্নকে নতুন করে সামনে এনেছে— সংস্কৃতির মূল স্তম্ভকে কি সেকুলারিজমের অজুহাতে অস্বীকার করা যায়?

ভূমিকে মা রূপে কল্পনা করা ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন ঐতিহ্য। এটি কোনো ঔপনিবেশিক বা সাম্প্রদায়িক নির্মাণ নয়। অথর্ববেদে বলা হয়েছে, 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ'— পৃথিবী আমার মাতা, আমি তাঁর পুত্র। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে দেশকে এক নারী শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— 'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং।' রামায়ণে উচ্চারিত হয়েছে— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' এই ঐতিহ্য ভারতমাতার স্বরূপে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভারতমাতার আবেগময় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা আনন্দমঠ উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম্' গানটি ভারতীয়দের জন্য এক আন্দোলনের মন্ত্র হয়ে উঠেছিল— 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।' এই গানের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে উর্বর, কল্যাণময় ও শস্যশ্যামলা রূপে উপস্থাপন করা হয়, যা ধর্ম, জাতপাত ও ভাষার ঊর্ধ্বে উঠে একটি অভিন্ন আবেগের অভিমুখ তৈরি করেছিল। এই গান ভূমিকে পবিত্র প্রতীক হিসেবে স্থাপন করে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেনি। ভারতমাতাকে তাই কেবল ধর্মীয় নয়, বরং একটি সংস্কৃতিগত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। আজও এই গান আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে সম্মানিত।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতমাতার মধ্যে দেখেছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তি ও জাতীয় সেবার মিশ্রণ। তিনি বলেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই হোক আমাদের একমাত্র আরাধ্য।' তাঁর ভাষায়— 'Let all other vain gods disappear for the time from our minds. This is the only god that is awaken— our own race— everywhere his hands, everywhere his feet, everywhere his ears, he covers everything.' এই আহ্বান নিছক কোনো রূপক নয়— এটি ছিল এক জীবন্ত শক্তির উপাসনা, এক বাস্তব চেতনার প্রতীক। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ভারতমাতা কোনো কল্পকথা নয়, বরং জাতির মূর্ত প্রতীক, যিনি তাঁর সন্তানদের কাছে দাবি করেন সেবা, আত্মনিবেদন ও পুনর্জাগরণ।

১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতমাতার প্রথম চিত্ররূপ আঁকলেন, যেখানে তাঁকে গেরুয়া মাতার এক শাস্ত্র-সংস্কৃতি-শ্রমনির্ভর রূপকে তুলে ধরেছিল, যা আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। ১৯০৯ সালে সুব্রহ্মণ্য ভারতী বিজয়া পত্রিকার প্রচ্ছদে ভারতমাতাকে ভারতের মানচিত্রের উপর দাঁড়িয়ে চারটি শিশুকে স্নেহে আশ্রয় দিতে দেখা যায়— যারা দেশের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের

প্রতীক।

এই ধারাবাহিক চেতনার প্রতিফলন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতভাগ্যবিধাতা কবিতায়ও। চতুর্থ স্তবকে তিনি ভারতমাতাকে একজন সজাগ, করুণাময়ী অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরেন— ‘জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে। ...স্নেহময়ী তুমি মাতা।’ এই চিত্র জাতির গভীর সাংস্কৃতিক সংকটে মাতৃরূপে ভারতের অভিভাবকত্বকে প্রকাশ করে।

১৯৩৬ সালের ২৫ অক্টোবর গান্ধীজী বারাণসীতে ‘ভারতমাতা মন্দির’ উদ্বোধন করেন। সেখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, পার্সি, বৌদ্ধ ও হরিজনদের এক বিশাল সমাবেশে গান্ধীজী বলেন, ‘এই মন্দিরে কোনো দেব-দেবীর মূর্তি নেই, এখানে আছে কেবল ভারতের মানচিত্র। মাতৃভূমিকে উৎসর্গ করাই এই মন্দিরের একমাত্র লক্ষ্য।’ তিনি আহ্বান জানান সবাইকে, মায়ের চরণে বিভেদ ভুলে নিঃস্বার্থ সেবা উৎসর্গ করতে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ‘ভারতমাতা কী জয়’ স্লোগান ছিল সর্বজনগ্রাহ্য। জওহরলাল নেহরু The Discovery of India গ্রন্থে লেখেন, তিনি প্রায়শই সভায় প্রশ্ন করতেন— ‘ভারতমাতা মানে কী?’ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা দিতেন— ‘ভারতমাতা বলতে আমরা বুঝি দেশের কোটি কোটি মানুষ... এই

বিপুল জনগোষ্ঠীই হলেন ভারতের প্রকৃত রূপ।’ এই ব্যাখ্যা ভারতমাতাকে কোনো প্রতিমা বা ধর্মীয় ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবন্ত জনসত্তার প্রতীক করে তোলে।

তাই যদি বলা হয়, সংবিধানে উল্লেখ না থাকায় ভারতমাতার কোনো সরকারি বৈধতা নেই, তাহলে সেটা হবে জাতীয় জীবনের একটি দৈন্যপীড়িত, সংকীর্ণ ও ইতিহাসবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ ভারতমাতার অস্তিত্ব ১৯৪৭ সালের বহু আগের। তিনি কোনো আইনত প্রতীক নন, বরং এক সভ্যতাগত চেতনার আধার। তাঁর বৈধতা কোনো সংবিধানের পাতায় নয়, বরং ভারতীয় জনমানসে শতাব্দী ধরে গেঁথে থাকা সংস্কৃতির গভীর আবেগে নিহিত।

আজ যারা বলেন, ভারতমাতা ‘ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী, তারা আদতে ভুল বুঝছেন— তিনি কোনো ধর্মের প্রতীক নন, বরং ভারতের পবিত্র ভূগোল, জাতীয় সংগ্রাম ও ভবিষ্যতের একাত্মতাবোধের প্রতীক। তাঁর চিত্রকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধ করা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়— এটি সভ্যতার স্মৃতিলোপ, এক গভীর আত্মবিস্মৃতির লক্ষণ।

ভারতমাতা সংবিধানকে প্রশ্ন করেন না— তিনি তাকে জীবনীশক্তি দেন। ভারতমাতা কোনো আইনসিদ্ধ অনুমোদনের অপেক্ষায় নেই, কারণ তিনি হলেন ভারতীয় আত্মার প্রতীক— আত্মা, যা থেকে সংবিধান অর্থ পায়। যেমন সংবিধানে জাতীয় সংগীত, জাতীয় পশুর উল্লেখ নেই— তেমনি ভারতমাতাও সাংবিধানিক শিরোনামে না থেকেও আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞান ও আত্মপরিচয়ের অপরিহার্য অংশ।

ভারতমাতার বিরোধিতা মানে ভারতের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার অস্বীকৃতি। তাঁকে বিতর্কিত করা মানে দেশকে এক সামাজিক চুক্তিতে রূপান্তর করা, যেখানে হৃদয়, ইতিহাস ও চেতনার জন্য কোনো স্থান নেই। কিন্তু আমাদের গণতন্ত্র যদি তার মূল চেতনাকে, মূল আত্মাকে ভুলে যায়, তবে তার শরীর হয়তো টিকে থাকবে, কিন্তু আত্মা হারিয়ে যাবে। তাই ভারতমাতার প্রত্যাখ্যান নয়, গর্বের সঙ্গে বলতে হবে— বন্দে মাতরম্। ভারতমাতা কি জয়!

(লেখক পেশায় আইনজীবী, শিলচর)

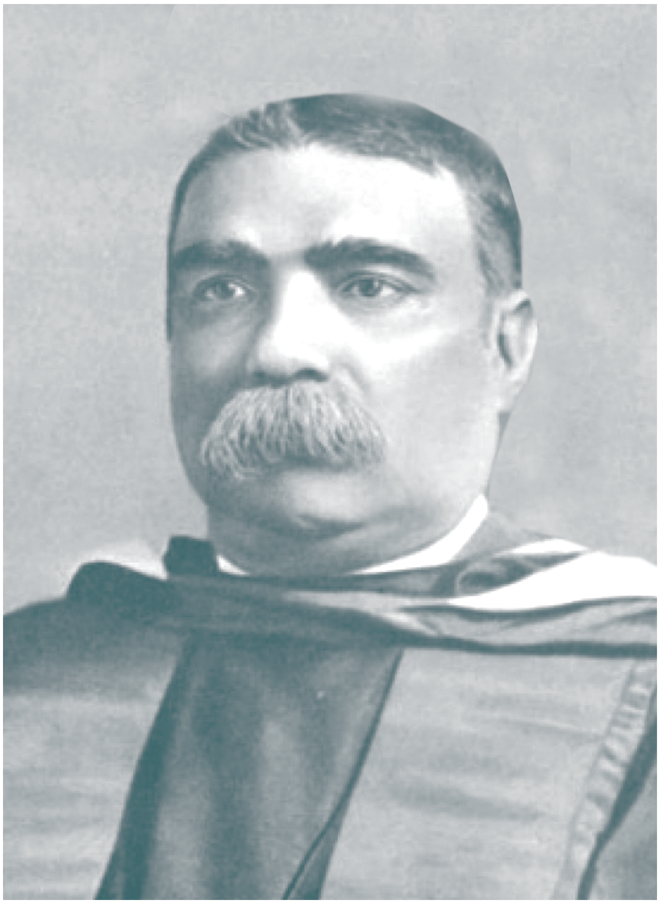

বহুমুখী প্রতিভায় ভরপুর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রদীপ মারিক

তখন আশুতোষের কিশোর বয়স। কলকাতায় এক বইয়ের দোকানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। এককপি রবিনসন ক্রুসোর পাতায় স্বাক্ষর করে উপহার হিসেবে তার হাতে তুলে দিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'মনোযোগ দিয়ে পড়ো'। আশুতোষ সারা জীবন তাঁর উপদেশ বেদবাক্য মনে করে সেই কথার অমান্য করেননি। কোন দিন কি পড়েছেন তা তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন ডাইরির পাতায়। কোন বই থেকে কোন চ্যাপ্টার তিনি পড়েছেন তাও তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। মাত্র ক'দিনে কতগুলো বই পড়ছেন তারও হিসাব পাওয়া যেত সহজে। কলেজে কোন সাহেব শিক্ষক কেমন পড়াচ্ছেন তাও লিখে রাখতেন। কোন কোন দিন কী পড়ছেন তার সাক্ষী থাকে তাঁর ডাইরি। কোন সময় সংস্কৃত পড়ছেন, বাঘা বাঘা অঙ্কের বই পড়ছেন, ফিজিক্সের বইও পড়েছেন— ব্যারাকপুর গঙ্গার তীরে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে তিনি যখন গিয়েছিলেন, সেখান থেকে বাবাকে চিঠি দিতেন তার সবটাই থাকতো পড়াশোনার কথা। ইংরেজিতে লেখা তিন খণ্ডের ইতিহাস বই তিনি বাংলায় এবং 'কথামালা', 'বোধোদয়' 'আখ্যানমঞ্জরী' বইগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

কলেজে পড়ার সময় একটা জব্বর অঙ্কের বই পড়া হচ্ছে না এই ভেবে তিনি ফরাসি ভাষাটাই শিখে নিলেন। বই পড়ার সঙ্গে নিয়মিত ছিল বই কেনা। বাবার সঙ্গে তার কলকাতার বিখ্যাত সব বইয়ের দোকানে যাতায়াত সেই ছোটোবেলা থেকে। আমৃত্যু তিনি বই সংগ্রহ করেছেন, কিনছেন এবং তা পড়ে তার মর্মার্থ উপলব্ধি করেছেন। শুধু কলকাতার বইয়ের দোকানে নয়, তিনি নিয়মিত যেতেন নিলাম ঘরে, সেখানে তিনি কিনতেন পুরোনো বই ও পুঁথি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল জার্মান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন প্রকাশকের। ন্যাশনাল লাইব্রেরির সুবিখ্যাত, 'আশুতোষ কালেকশন'-এ রয়েছে তাঁর সংগৃহীত বই এবং অন্যান্য সামগ্রী। সংখ্যাটা ৮৫ হাজারেরও বেশি। আইন, গণিত, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, ইংরেজি সাহিত্যের বিপুল সম্ভার তো রয়েছেই, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকার আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ে, স্থাপত্যবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, চিত্রকলার অগুনতি বই। এছাড়াও ছিল ওক কাঠের প্রচ্ছদে ১৮৪৯ সালের বাইবেল, মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো আর গথিক স্ক্রিপ্টে লেখা গেথেট ফাউস্ট-এর মতো কত দুর্লভ বই যে তাঁর সংগ্রহে ছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। ছেলেবেলা থেকেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দুটো লক্ষ্য ছিল— একটা 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' স্কলারশিপ পাওয়া আর একটি হাইকোর্টের জজ হওয়া। দুটো ইচ্ছাই তার পূর্ণ হয়েছিল।

তিনি ১৮৮৫ সালে গণিতে এবং পরের বছর পদার্থবিদ্যায় এমএ পাশ করেন। গণিতে এমএ পাশ করার পরের বছরই তিনি এমএ গণিতের পরীক্ষক হন। আগাগোড়া ভালো ফলাফল দেখে তাঁকে সাহেব কর্তারা চাকরির প্রস্তাব দিলেন। তাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেওয়ার কথা বলা হয়। তিনি শর্ত দিলেন, চাকরি করতে পারেন তবে সাহেব শিক্ষকদের সমান বেতন ও পদমর্যাদা

দিতে হবে এবং তাঁকে গবেষণার সুযোগ দিতে হবে। এই তরুণের স্পর্ধা দেখে সাহেবরা হতভম্ব। তদানীন্তন সাহেব উপাচার্য তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কী সাহায্য তিনি করতে পারবেন। তিনি চাইলেন সেনেটের সদস্যপদ। তিনি এই সেনেট সদস্য হয়েই ছাড়লেন যখন তার মাত্র ২৫ বছর বয়স।

কলকাতার বৌবাজারে মলঙ্গা লেন থেকে মুখুজ্যে বাড়ির ছেলে ছোটোবেলা থেকে পড়াশোনার মধ্য দিয়ে যে জায়গায় নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন সে জায়গায় পৌঁছতে তার অধ্যাবসায়ের কথা ভাবলে বাঙ্গালি হিসেবে গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। এত ছোটোবেলা থেকে যে এত পড়াশোনা করা যায়, পড়াশোনা করলে মনেও রাখা যায়। শুধু মনে রাখা নয়, তা কাজে লাগানো যায়। শুধু কাজে লাগানো বললে ভুল হবে ব্রিটিশদের অধীনে সরকারি চাকরি আর নিরাপদ জীবনের গন্তব্যে এসেও ব্রিটিশদের অনুগত দাস হয়ে না থেকে নিজের সঙ্গে নিজের ভাষা জাতি ও সংস্কৃতির এবং তার সঙ্গে সেই সময়ের সব মানুষের ভাবনাচিন্তা ও আদর্শকে তুলে ধরা যায় শুধু নয়, গবেষণামূলক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে জীবন যাপনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

চেষ্টা করলে পারা যায়। তিনিই পেরেছিলেন। তাই তো তিনি বাঙ্গলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাবা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন যশস্বী ডাক্তার। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের বাংলা বইয়ের খুব অভাব দেখে তিনি প্র্যাকটিসের ফাঁকেই লিখলেন বেশ কয়েকটা বই। যে মানুষটি রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন কবিতায়, আবার তিনিই সাংসারিক হিসাবনিকাশ লিখে রাখতেন তার খাতায়।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের খাতাগুলি ঐতিহাসিক এই কারণে, সেই খাতায় আশুতোষের জন্মতারিখ থেকে তার বই কেনার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছিল সব হিসেব লিখে রেখে দেওয়া হয়েছিল। নীলমণি মিত্রের পূজাদালানে বসতো চক্রবেড়িয়া শিশু শিক্ষালয়। যখন তাঁর পাঁচ বছর বয়স, তখন তাকে এই শিক্ষালয়ে ভর্তি করানো হয়। প্রথমদিন স্কুল থেকে ফিরেই ছেলে বলল, ও তো স্কুল নয় যেন যাত্রার আসর। কারণ সে কিছুদিন আগেই একটা যাত্রা দেখতে গিয়েছিল। পূজাদালানে ওই চেঁচামেচিকে যাত্রার আসর ভেবে থাকবে। বাবার সঙ্গে খুব ভোরে ওঠা, বাবার সঙ্গে খানিক বেরিয়ে এসে পড়তে বসা, তার সঙ্গে পুরোনো পড়া ঝালিয়ে নেওয়া— এটাই ছিল তার নিত্য দিনের কাজ। বাবা ভাবলেন, ছেলে ঘরেই ভালো পড়বে, তাই গৃহ শিক্ষকের ব্যবস্থা করলেন। তিনি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে তখন মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কবিতার প্রথম পরিচ্ছদ কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন যা এখন স্নাতকস্তরের পাঠ্য।

এক সময় আইন পড়লেন এবং ১৮৮৮ সালে কলকাতা হাইকোর্টের উকিল হলেন। তারপর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন। বিচারপতি থাকাকালীন তিনি প্রায় দু' হাজার রায় দিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে যখন তিনি উপাচার্যের পদে আসীন সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গের মান্যগণ্য মানুষরা বলতো, 'গোলদিঘির গোলামখানা'— ব্রিটিশদের চাকর তৈরির জায়গা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হাতে নেওয়ার পরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছোটালেন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মতো। নিয়মিত ক্লাস, পড়াশোনা এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। তিনি বুঝিয়ে দিলেন উচ্চশিক্ষার মধ্যেই গবেষণা লুকিয়ে আছে। সেই গবেষণার দিক তিনি উন্মোচিত করলেন। পাঠ্যসূচি সংস্কার করলেন, খুললেন নতুন নতুন বিষয়। সেই বিষয়ের জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এলেন পদার্থবিদ্যায় সিভি রমণ, রসায়নে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, গণেশ প্রসাদ, মেঘনাথ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো দিকপাল শিক্ষকরা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে পড়াতে এলেন দর্শনশাস্ত্রের জন্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল ভিনোগ্রাডফ, বিখ্যাত ফরাসি অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি। বিশ্ববিদ্যালয় স্বশাসিত সংস্থা হলেও এক সময় এমএ শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার টাকার অভাব দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকার টাকা দেবে তার বদলে মুচলেখা দিতে হবে তা প্রকারান্তরে দাসখত নেওয়ার নামান্তর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্যার আশুতোষ দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, না খেয়ে থাকবো তবু ব্রিটিশদের গোলামি করবো না।

ফ্রিডম ফার্স্ট, ফ্রিডম সেকেন্ড, ফ্রিডম অলওয়েস। তিনি সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতেন গবেষণাকে। যে ছেলের মাত্র সতেরো বছর বয়সে গণিতের ওপর লেখা কেমব্রিজ গণিত পত্রিকায় ছাপা হয়, তার তো গবেষণাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। 'মৈমনসিংহ-গীতিকার' সম্পাদনার কাজ দীনেশচন্দ্র সেন করতে পেরেছিলেন তাঁরই প্রেরণায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকার সময় বাংলাভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এনেছিলেন। তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে বললেন এমএ বাংলা চালু করার জন্য সিলেবাস তৈরি করুন। পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলে আবার তাকে বাংলায় এমএ পড়ানোর জন্য ভর্তি করেন।

কোর্টের সময়টুকু ছাড়া তিনি বাকি সময়ে ধুতি, পঞ্জাবি, চাদর পরতেন, বলতে গেলে তিনি ছিলেন ধোপদুরস্ত বাঙ্গালি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর মৃত্যুর পর এক স্মরণসভায় বলেছিলেন, 'এখন যে বাংলাভাষায় আমরা কথা বলছি, তার জন্য আমরা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী।' তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং জাতীয় শিক্ষার সুফলগুলি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেনেসাঁ ঘটিয়ে ফেলেন। তিনি একধারে গণিত, রসায়ন, সংস্কৃত, আইনবিদ, শিক্ষাবিদই ছিলেন না। তিনি ছিলেন বহু বিদেশি ভাষায় পারদর্শী। এমন বহুগুণসম্পন্ন মানুষের জন্যই তো ফরাসি পণ্ডিত, সিলভাঁ লেভি বলতে পারেন, এই বেঙ্গল টাইগার ফ্রান্সে জন্মালে ফ্রান্সের টাইগার জর্জেস ক্লেমেন্সোকেও ছাড়িয়ে যেতে পারতেন। □

ফঃ ৫

ইউনুসকে সামনে রেখে জঙ্গিদের ক্ষমতা দখলের ছক তৈরি হয়

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ থলের বিড়াল বেরিয়ে আসছে। শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুস উগ্র ইসলামি শক্তিগুলোকে এককাট্টা করে রক্তাক্ত পথে কীভাবে ক্ষমতা দখল করেন, তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। পাকিস্তানে লস্কর-ই-তৈবার শীর্ষ নেতা কয়েকদিন আগে দাবি করেছে, বাংলাদেশে গত বছর জুলাই-আগস্টে জেহাদি অভ্যুত্থানে তারাই কাজ করেছে। পাকিস্তানের ডন পত্রিকা জানিয়েছে, লস্কর-ই-তৈবা নেতা বলেছে 'আমরা একাত্তরের (১৯৭১ সালের) প্রতিশোধ নিয়েছি। ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করবো।'

সম্প্রতি বাংলাদেশে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। (১) গত ৮ জুন নড়াইলে সোহান মোল্লা নামে এক কলেজ ছাত্রের বাড়ি থেকে সেনাবাহিনীর সেনারা ৭.৬২ বোরের একটি স্নাইপার রাইফেল উদ্ধার করেছে। গভীর রাতে সেনা অভিযান চালিয়ে বিছানার নীচ থেকে এই দূরপাল্লার রাইফেল উদ্ধার হয়। সোহান মোল্লা জুলাই-আগস্টের ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। (২) এর আগে রাজধানী ঢাকার উত্তরায় আবদুল্লাপুর এলাকা থেকে স্নাইপার রাইফেলের বেশ কিছু গুলি উদ্ধার করে সেনাবাহিনী। (৩) মাগুরায় সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে ২৩ থেকে ২৫ বছর বয়সি পাঁচ তরুণকে আটক করে, তাদের কাছ থেকে স্নাইপার রাইফেলের ১০০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। তাদের কাছে স্নাইপার বাইনোকুলারও পাওয়া যায়। কিন্তু রাইফেল পাওয়া যায়নি। এই তরুণরা জুলাই-আগস্টের তথাকথিত ছাত্র আন্দোলনে জড়িত ছিল।

পেছন ফিরে তাকানো যাক। গত বছর আগস্ট মাসে হিংসাত্মক আন্দোলনের সময় সারাদেশে সাড়ে চারশো থানা লুট হয়। কী পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এসব থানা থেকে লুট হয়েছে তার কোনো হিসেব পাওয়া যায়নি। অনেক কারাগারে হামলা করে অস্ত্রশস্ত্র লুট করা হয়েছে। গত বছর জেহাদি অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিতাড়ন করার পর ছাত্র-জনতা সেখানে ঢুকে যথেচ্ছা লুটপাট চালায়। গণভবনের নিরাপত্তায় ছিল স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ), যাদের কাছে ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা গণভবন ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে পারেননি। লুট হয়ে যায় সেসব অস্ত্রশস্ত্রও।

কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, আন্দোলনের সময় ছাত্রদের হাতে প্রচুর অস্ত্র দেখা গেছে। অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা, বর্তমানে অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুসের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন না হলে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার প্রস্তুতি ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের। তবে এই অস্ত্র তারা কার কাছ থেকে পেত, এ প্রশ্নের কোনো জবাব সে দেয়নি। সম্প্রতি এই উপদেষ্টা মরক্কোয় এক যুব সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে রওনা হওয়ার সময় ঢাকা বিমানবন্দরে তার ব্যাগ স্ক্যানিঙের সময় আগ্নেয়াস্ত্র ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। শেখ হাসিনার সময় বিমানবন্দরে অস্ত্র-সহ ধরা পড়ার পর আওয়ামি লিগের কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে কারাভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু ইউনুসের জমানায় তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের এক সদস্যকে কোনো আইনি সমস্যায় পড়তে হয়নি। সজীব ভুঁইয়া কৈফিয়ত দেন, তার ব্যক্তিগত অস্ত্র অসতর্কতাবশত ব্যাগে রয়ে যায়। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জাহাঙ্গির আলম চৌধুরীও বলেছেন, এটা নেহাতই অসতর্কতা। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রশ্ন তুলছে, এই উপদেষ্টার বয়স ২৭ বছর। ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র পেতে হলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৩০ বছর বয়স হতে হবে এবং তিন বছরে অন্তত তিন লক্ষ টাকা আয়কর জমা দিতে হবে। যার কোনো শর্তই আসিফ ভুঁইয়া পূরণ করেননি। ড. ইউনুস সব সময় বলে থাকেন, তিনি দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান।

গত এপ্রিল মাসে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তাঁর মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু জেহাদি অভ্যুত্থানের সময় কত অস্ত্র লুট হয়েছে, কত উদ্ধার হয়েছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান দেননি।

জাতিসঙ্ঘ এক প্রতিবেদনে বলেছে, গত বছরের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৪০০-র মতো মানুষ প্রাণ হারিয়ে থাকতে পারেন। এর মধ্যে ৬৬ শতাংশ নিহত হয়েছেন ৭.৬২ বোরের রাইফেলের গুলিতে। ৫ আগস্টের আগে কত নিহত হয়েছেন,

বাংলাদেশে জঙ্গিদের সংগঠিত করার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল শেখ হাসিনার শাসনকে উৎখাত করা, এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল।

পরে কত নিহত হয়েছেন, তার যথাযথ তথ্য সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসঙ্ঘকে দেওয়া হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে কারা কারা ৭.৬২ বোরের গুলিতে প্রাণ হারান এবং প্রাণহানির পর সেসব এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেসব সদস্য নিয়োজিত ছিল, তাদের কাছে সে সময় স্নাইপার রাইফেল বা ৭.৬২ বোরের গুলি ছোঁড়ার অস্ত্রশস্ত্র ছিল কিনা তারও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

জাতিসঙ্ঘ বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও নিহতদের শরীর থেকে উদ্ধারকৃত বুলেট দেখার নাকি সুযোগ পায়নি। আর সবচেয়ে বড়ো সন্দেহ ৭.৬২ বোরের গুলি নিয়ে, সেটা যে 'অসামরিক নাগরিকদের' হাতে ছিল সে সন্দেহ প্রথম সূচনা করেন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সাখাওয়াত হোসেন। গত বছরের ৮ আগস্ট শপথ গ্রহণের পর ১১ আগস্ট হাসপাতালে আহত আনসার সদস্যদের দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'দেখা যাচ্ছে এই আনসার সদস্যদের বেশিরভাগই আহত হয়েছেন ৭.৫২ বোরের গুলিতে। এছাড়া অন্যান্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আনসারদের মধ্যে বেশিরভাগই আহত হয়েছেন ৭.৬২ বোরের গুলিতে। অথচ তাদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ করার কোনো কারণ নেই। তাদের ওপর গুলি করেছে 'অসামরিক পোশাক পরা (তাঁর ভাষায় সিভিলিয়ান)' লোকজন। অর্থাৎ তাদের আনসার ভবনের ভেতরে থাকা অবস্থায় ৭.৬২ বোরের গুলি করা হয়েছে। পুলিশ করেনি। এই 'বেসামরিক পোশাক পরা নাগরিকদের' আনসারদের ওপর গুলি চালানোর ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। আমাদের জানা দরকার 'অসামরিক পোশাক পরে' কারা আনসারদের ওপর গুলি ছুড়ল?

এই মন্তব্য করার পরই উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুস তড়িঘড়ি সাখাওয়াত হোসেনকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন।

জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধিদল এবং সাখাওয়াত হোসেন ৭.৬২ বোরের গুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা, বর্তমানে তাদের হাতে গড়া জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ নেতা সারজিস আলম প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তিনি অত্যন্ত উগ্রভাবে বলেন, 'ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছেন, কোনো অজুহাতে তাদের মৃতদেহ কবর থেকে তোলা যাবে না। যদি এই ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়, ছাত্র-জনতা আবার রাজপথে নামবে।' এর পরই বিষয়টি নিয়ে আর কেউ কথা বলেননি। এখানেই রহস্য লুকিয়ে।

আরও লক্ষ্য করা গেছে, গত বছরের জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুরু হলে জামায়াতে ইসলামি-সহ ইসলামি উগ্রবাদী দলগুলো এবং বিএনপি হঠাৎ করেই অতিসক্রিয় হয়ে ওঠে। আন্দোলনের গোড়ার দিকে ছাত্রদের দাবি ছিল সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের। তখন লক্ষ্য ছিল একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া। সরকার কোটা পদ্ধতি বাতিল করলেও আন্দোলন থামেনি। অত্যন্ত দ্রুত তারা সরকার পতনের আন্দোলনে শামিল হয়। এ সময় লক্ষ্য করা যায়, গোপনে সংগঠিত সশস্ত্র উগ্রবাদী জঙ্গিরা সারাদেশ থেকে রাজধানীতে ঢুকে পড়েছে। এখন জানা যাচ্ছে, আইএস (ইসলামিক স্টেট), হিজবুত তাহরির, লস্কর-ই-তৈবা, জেএমবি (জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ) এবং হরকাতুল জেহাদই ছাত্রদের সামনে রেখে এই তথাকথিত গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করে। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদের নানাভাবে প্রস্তুত করা হয়। তাদের অনেকে পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে। শেখ হাসিনার নানা গোয়েন্দা বাহিনী কোনোভাবেই এই তৎপরতা টের পায়নি। অথবা যারা টের পেয়েছিলেন ইসলামের স্বার্থে তারা চুপ ছিলেন। এই তথাকথিত গণঅভ্যুত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছিল। ভূমিকা ছিল জাতিসঙ্ঘেরও।

কয়েকদিন আগে কুয়ালালামপুর থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে মালয়েশিয়ায় ৩৬ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার বাংলাদেশিদের দলটি সিরিয়া ও বাংলাদেশে 'ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সেলগুলোকে অর্থ পাঠাত বলে তথ্য দিয়েছেন মালয়েশিয়ার পুলিশ প্রধান। মালয়েশিয়া পুলিশের মহাপরিদর্শক মহম্মদ খালিদ ইসমাইল ৪ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে পরিচালিত ধারাবাহিক অভিযানে ওই ৩৬ বাংলাদেশিকে আটক করা হয়; তারা মূলত কারখানা, নির্মাণ ও সেবা খাতে কর্মরত ছিলেন।

রয়টার্স জানাচ্ছে, গোয়েন্দা তথ্যের বরাতে খালিদ ইসমাইল বলছেন, বাংলাদেশিদের ওই চক্রটি অন্য বাংলাদেশি শ্রমিকদের মধ্য থেকে সদস্য বাড়াচ্ছিলেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে 'উগ্রবাদী মতাদর্শ' ছড়াচ্ছিলেন।

আর একটি সূত্র বলছে, এই উগ্রবাদী চক্রটির সঙ্গে বাংলাদেশের তথাকথিত গণঅভ্যুত্থানের নেতাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ছাত্রনেতাদের কয়েকজন মালয়েশিয়ায় ছিলেন। কয়েক মাস আগে ছাত্র নেতারা জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নামে যে রাজনৈতিক দল গঠন করেছে তা মূলত জামায়াতে ইসলামি প্রভাবিত এবং আইএস (ইসলামিক স্টেট), হিজবুত তাহরির, লস্কর-ই-তৈবা, জেএমবি (জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ) এবং হরকাতুল জেহাদের জঙ্গি চিন্তাধারা ও জেহাদি রণকৌশলে সংগঠিত। এক গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, এনসিপির ৪০ শতাংশ নেতা-কর্মী সরাসরি জামায়াতে ইসলামির সক্রিয় সদস্য এবং বাদবাকিরা ওইসব জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত।

আরও একটি খবরে বলা হয়েছে, ছাত্ররা কয়েক বছর ধরেই এই আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছে। তাদের কাছে তহবিল এসেছে ব্রিটেন, তুরস্ক, কাতার, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তান থেকে অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুস পরিচালিত যুক্ত এনজিওগুলোর মাধ্যমে। এই এনজিওদের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ইউনুস। যোগাযোগ রক্ষা ও জঙ্গিদের সংগঠিত করে পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। আরও জানা গেছে, গত এক বছর ধরে বাংলাদেশে মাদ্রাসা ও এতিমখানায় কয়েক লক্ষ ছাত্র-যুবক গোপনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে হিজবুত তাহরির ও লস্কর-ই-তৈবা। সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিল জেএমবি ও হরকাতুল জেহাদ। ড. ইউনুসকে সামনে রেখে এগুলোর ছক কষা হয় বেশ আগেই।

বাংলাদেশে জঙ্গিদের এভাবে সংগঠিত করার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল শেখ হাসিনার শাসনকে উৎখাত করা, তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। এ বছরের গোড়ার দিকে কথিত গণঅভ্যুত্থানের 'মাস্টারমাইন্ড' বলে চিহ্নিত মাহফুজ আলম (বর্তমানে তথ্য উপদেষ্টা) নিজের ফেসবুক পেজে এক নিবন্ধে তা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও অসম বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেছিলেন। দেশে-বিদেশে এর প্রতিক্রিয়া হয় ব্যাপক। ফলে তিনি নিবন্ধটি সরিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশে জঙ্গি ছাত্রবাহিনী, বর্তমান শাসকরা ড. ইউনুসের নেতৃত্বে কোন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন তা অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে ছাত্র আন্দোলনের মূল সুরটা চেনা যাবে। তাদের শেকড় কোথায় প্রোথিত তাও জানা যাবে। নোবেল শান্তি বিজয়ী ক্ষমতার লোভে এখন জঙ্গি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, বাংলাদেশের নেতৃত্বে ভারতের সাত রাজ্য নিয়ে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) পতাকা ওড়াতে চান। □

ভুলে যাওয়া এক ইতিহাস

ভোলানাথ সেনের 'প্রাচীন কাহিনী'

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

কলকাতা-কেন্দ্রিক তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ভীরুতা ও মেরুদণ্ডহীনতার একটি ইতিহাস স্মরণের জন্যই আজকের এই নিবন্ধের অবতারণা। সেই লোকটা ছিলেন শিক্ষিত, নিপাট এক ভদ্রলোক। সাতে-পাঁচে না থাকা লেখক-বাঙ্গালি। এবং অবশ্যই ধর্মে হিন্দু। কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের ব্যবসা করেন, সঙ্গে লেখালেখি। 'সেন ব্রাদার্স'-এর কর্ণধার ও প্রকাশক। ভোলানাথ সেন। সকালে নিজের দোকানে প্রতিদিনের কাজকর্ম করছিলেন দুই কর্মচারী সতীশ ও হরিদাসকে নিয়ে। তখনই ঘটে গেল ঘটনাটা। দিনের বেলায় কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে ঘটলো নৃশংস ভয়ংকর হত্যালীলা। লাহোর ও পঞ্জাব থেকে আসা আবদুল্লা খান ও আমির আহমেদ নামে দুই জেহাদি যুবক প্রবল হিংস্রতায় ছোরার আঘাতে ভোলানাথ সেন ও তার দুই সহকারীকে হত্যা করে ফেলল। তখন ভিড়ে থিক থিক করছিল প্রতিদিনের ব্যস্ত বই-বাজার কলেজস্ট্রিট।

ঘটনা ১৯৩১ সালের ৭ মে। 'অপরাধ' বড্ড বাড়াবাড়ি অবশ্য। 'প্রাচীন কাহিনী' নামে একটি পুস্তক রচনা করে ফেলা। লেখক ও প্রকাশক 'সেন ব্রাদার্স'-এর ভোলানাথ সেন। বইটি তৎকালীন সময়ে সরকার অনুমোদিত গল্পের আকারে বিশ্ব ইতিহাস বোঝানোর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য ছিল। বইটিতে ছিল যিশুখ্রিস্ট, হযরত মহম্মদ প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের মহানুভবতার ভালো ভালো কথা। তবে চটি আকারের সেই বইটিতে ছাপা হয়েছিল হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত দেবদূত গাব্রিয়েলের সঙ্গে হযরত মহম্মদের আলাপচারিতার একটি 'সামান্য ছবি'। নিজের আঁকা নয়, লেখক ভোলানাথ সেন ছবিটি সংগ্রহ করেছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে। সত্যিই তো এত আস্পর্ধা! হযরত মহম্মদকে ছবিতে আঁকা! হিংস্র জেহাদিরা খোঁজ নিল না, এই ছবি কোনো ভারতীয়রও আঁকা নয়, এঁকেছিলেন পঞ্চদশ শতকের এক তুর্কি শিল্পী। ছবিটি ইসলামি মজহবি গ্রন্থ কোরানের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এডিশনে অন্তর্ভুক্ত।

তবে এ-ঘটনা নতুন নয়। সেই হাদিসের সময়কাল থেকেই এমনি নৃশংসতা বহন করছে ইসলামি জেহাদিরা। ভারত এর সাক্ষী হয়েছে বহু আগেই। ১৯২৩ সালে 'রঙ্গীলা রসুল' নামে একটি বই প্রকাশ হয়। বিষয় হযরত মহম্মদের ব্যক্তিগত জীবন। বইটিতে হযরত মহম্মদের তেরো স্ত্রী এবং দুই দাসীর রঙিন জীবনের কথা চিত্রিত হয়েছে। পরিকল্পিত ভাবে মুসলমানদের উসকানো শুরু হলো— এ বই ইসলাম ও নবী'কে খাটো করার জন্য লেখা হয়েছে। অনেক বিতর্কের পর সবশেষে বিচারের আওতায় আসে প্রসঙ্গটি। হাইকোর্ট রায় দেয়, এ পুস্তকে কোনো ভুল নেই, কারণ বিষয়টি হাদিস ও সীরাত গ্রন্থে উল্লেখিত। বইয়ের লেখকের নাম জানা না গেলেও প্রকাশক ছিলেন রাজপাল মালহোত্রা।

বিচারব্যবস্থাকে তোয়াক্কা না করে স্বাভাবিকভাবে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী হত্যা করা হলো 'রঙ্গীলা রসুল'-এর প্রকাশ রাজপাল মালহোত্রাকে। বইয়ের ভক্ত-অনুরাগী সেজে বাড়িতে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল, 'কোরান' ও 'হাদিস'-এ অনুপ্রাণিত ইলিমুদ্দিন নামে এক জেহাদি যুবক। এই অন্যায় ও নৃশংস হত্যার পরও এই জেহাদি গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে বীরের মর্যাদা পেয়েছিল। তার পক্ষে মামলা লড়েছিলেন পাকিস্তানের জন্মদাতা আইনজীবী আলি জিন্না। খুনির প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা'র লেখক স্যার মহম্মদ ইকবাল। চতুরতার সাহায্যে বিরুদ্ধে মতকে হত্যা করা ইসলামের হাদিসের এই নির্ভুল নির্দেশ, মজহবটার জন্ম থেকেই অনুসরণ হয়ে আসছে। ইহুদি কবি কাব ইবনে আশরাফের হত্যাও হযরত মহম্মদ একইভাবে কবির অনুরাগী সাজিয়ে, মিথ্যা পরিচয় দিয়ে করিয়েছিলেন। হাদিসেই সে কথা

লেখা আছে।

আসলে কথায় কথায় কেউ কেউ কাটমোল্লারা কী বলল, তা ইসলামের কথা নয়— এমন দাবি করেন। খুন-ধর্ষণ-সন্ত্রাস-ধর্মান্তরণ ইসলামের কোরান ও হাদিসের বিষয় নয় বলে আসল বিষয় থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করেন কেউ কেউ। সেইসব ভীতু, মেরুদণ্ডহীন, ধান্দাবাজ, শিক্ষিত, তথাকথিত হিন্দু-বুদ্ধিজীবীদের উন্নত ইসলামি মজহবি সন্ত্রাসীদের প্রকৃতি বোঝা ও বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্য ও সতর্কবাণী স্মরণ করানো প্রয়োজন। ১৯৩৯ সালে অমিতা সেনকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন— 'হিন্দুর লেখা সাহিত্যে হিন্দুর মনোভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে বলে আজকাল মুসলমানেরা নালিশ করছে। এর একমাত্র প্রতিকারের উপায় হিন্দু সাহিত্যিকদের ধরে ধরে মুসলমান করে দেওয়া।' ভেতরটা কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো করে সেই চিঠিতেই এর পরে তিনি লিখছেন— 'আমরা তো শেষ প্রহরে এসে পৌঁছেছি, এখন সমস্যাটা তোদেরই স্কন্দে এসে চাপবে। হরিজনরা মুসলমান হওয়ার জন্য কোমর বাঁধছে, তারপরে তোদের পালা আসবে। কোরানের তরজমা যদি হাতের কাছে থাকে তাহলে এখন থেকেই পড়তে শুরু করে দে!'

তবে এক্ষেত্রে মুসলমানরা কিন্তু একেবারে এককাট্টা। নিজেদের মজহবের দোহাই দিয়ে খুন-ধর্ষণ-সন্ত্রাসের পক্ষে সাফাই দেওয়ার জন্য প্রায় সকলেই মানসিকতায় জেহাদি। বাইরের প্রকাশে চালাকেরা নীরব, তবে তারা অবশ্যই সমর্থক। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঠিক রোগ ধরতে পেরেছিলেন— 'হিন্দু নারী হরণের ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলো প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করে মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এত বড়ো অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছে না কীসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দ থাকার অর্থ কী? কিন্তু মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাহারা শুধু অতি বিনয়বশতই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না— বাবু, আপত্তি করব কী, সময় ও সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।'

বড়ো আশ্চর্য লাগে সংস্কৃতিবান, রবীন্দ্রপ্রেমী হিন্দু বাঙ্গালি কেমন তুমুল চতুরতায় 'ভোলানাথ সেন হত্যা মামলা ১৯৩১' বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছেন এতদিন। মুসলমান সম্প্রদায় এই নৃশংস হত্যার কোনো প্রতিবাদ করেছিল কিনা ইতিহাসে খুঁজে না পাওয়া গেলেও, এই দুই সন্ত্রাসীকে মুসলমানরা সেদিন বীরের সম্মান দিয়েছিল। এদের দেখার জন্য মুসলমান নর-নারী প্রতিদিন লাইন লাগাতো আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। বঙ্গের পরবর্তীকালের প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এই সন্ত্রাসীদের পক্ষে লড়েছিলেন হাইকোর্টে। এই খুনিদের বাঁচাতে কোর্টে উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ রায়বাহাদুর হিদায়েত হুসেন। বিচারপতির সামনে অধ্যক্ষ সাহেব সেদিন জোর গলায় বলেছিলেন— 'মহম্মদের ছবি তাঁর বইতে ব্যবহার করে ভোলানাথ সেন ইসলামকে অপমান করেছেন এবং সেই অপরাধ শাস্তিযোগ্য।' হত্যাকারীদের নয় বরং যাদের হত্যা করা হলো তাদের শাস্তির পক্ষেই সেদিন জোরালো বক্তব্য পেশ করেছিলেন উচ্চশিক্ষিত একজন অধ্যক্ষ। কারণ তাঁর মজহব যে ইসলাম, আর হত্যাকারীও মুসলমান। সরকারি কৌসুলি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন— 'ভোলানাথ সেন যে ছবিটা বইতে ব্যবহার করেছেন, গভর্নমেন্ট হাউসে সেই ছবির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, মি. হুসেন?' উত্তরে এই অধ্যক্ষ সাহেব বলেছিলেন— 'উপস্থিত থাকা না থাকা বিষয় নয়, এটা ইসলামের অপমানের বিষয়।'

বিচারক উইলিয়ামস্ দু'জন হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছিল। তারপরও তাদের মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য বঙ্গের বিধানসভার সদস্য স্যার আব্দুল্লা সুরাওয়ার্দি, ঘুজনভি ও আশারাফ আলি প্রভৃতি ব্যানিংহ্যাম প্যালেসে টেলিগ্রাম করেছিলেন। আর্জি ছিল হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড রদ করার। ইংরেজ বিচারব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলার পর অবশেষে দুই হত্যাকারীর ফাঁসি হয়ে যায় ১৯৩২ সালের ১০ মার্চ। দীর্ঘ এই পর্বে কিংবা তারও পরবর্তী কোনো সময়ে নিরপরাধ, উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, মুক্তচিন্তক ভোলানাথ সেনের হত্যার প্রতিবাদ কোনো হিন্দুর পক্ষ থেকে হয়েছিল কিনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আজও কলেজ স্ট্রিটে কোথাও ভোলানাথ সেনের কোনো মূর্তি নেই। নেই তাঁর নামে একটা ছোটোখাটো রাস্তাও। শিক্ষায় মুক্ত চিন্তার প্রসারের অগ্রণী এই মানুষটির নির্মম মৃত্যুর ইতিহাস সুকৌশলে ভুলিয়ে রেখেছে তথাকথিত শিক্ষিত অগ্রণী বাঙ্গালিরা। আসলে এরাই ভেতরে ভেতরে মজহবি সন্ত্রাসবাদকে লালন পালনকারী বুদ্ধিজীবী।

হয়তো এটাই সত্যি যে, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বলে জাহির করা এই বাঙ্গালিরা ইতিহাসটা আরও ভালো করে জানে এবং অন্য সবার চেয়ে বেশি করেই জানে। আর জানে বলেই তাদের কলম থমকে রয়েছে। গলার স্বর চেপে গেছে। জানে বলেই বিবেক-বুদ্ধি বন্দক দিয়েছে অন্যের কাছে। কারণ ভোলানাথ সেনের মতো তাদেরও টুক করে কখন ঘাড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায়! সেই তুমুল ভয়ই আসল কারণ। ভয় ইসলামি জেহাদকে। সে ভয় তাদের পিছু ছাড়েনি আজও। □

শোকসংবাদ

মালদহ জেলার গাজোলের প্রবীণ স্বয়ংসেবক অনন্ত সরকার ওরফে লাইসন সরকার গত ২ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন সঙ্ঘের খণ্ড, মহকুমা ও জেলার দায়িত্ব পালন করে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। গাজোলে শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তিনি ১ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

নরেন্দ্রপুরে আমার চার বছর

আজও মনে পড়ে ২০২০ সালের কথা। তখন সারা বিশ্ব কোভিড-১৯-এর কবলে আবদ্ধ। সবার তখন গৃহবন্দি দশা চলছিল। সেই সময় লক ডাউনের সদ্ব্যবহার করে, অনেক পরিশ্রম করে ভগবানের কৃপায় আমি সুযোগ পেলাম এক আনন্দধামে ভর্তি হওয়ার। আমি তার নাম দিয়েছি দেবালয়— নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়।

তখন আমি পঞ্চমশ্রেণীর একজন ছাত্র। তখন থেকেই শুরু হয় আমার এক অন্য ও অদ্ভুত জীবন। পঞ্চমশ্রেণীতে ভর্তি হয়ে আমি ভাবতাম, এ কেমন জায়গা, যেখানে সারাদিন একটা ঘণ্টা বেজে চলেছে আর সেই ঘণ্টার তালে তালে সবাই নীরবে নিজের নিজের কাজ যাচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে ওঠা আর রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ শুধু কানের কাছে ঘণ্টাটি বেজে চলত। পরে আমি পরিচিত হলাম নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ঘণ্টাময় ও ঘটনাময় জীবনের সঙ্গে।

শুধু এখানকার আদবকায়দা শিখতে শিখতে পুরো পঞ্চমশ্রেণী অর্থাৎ একটি বছর আমার কেটে গেল। প্রথম দিকে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমার খুব অসুবিধা হতো। কিন্তু মানুষের ধর্ম হলো পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, তাই আমিও নিজেকে এই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিলাম।

তারপর এই বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময় তালিকা অনুসরণ করতে করতে কখন যে ষষ্ঠ ও সপ্তমশ্রেণী কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। এখন আমি অষ্টমশ্রেণীর ছাত্র। ইতিমধ্যে এই দেবালয়ে আমার চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন এই বিদ্যালয় সম্পর্কে আমার ধারণা অনেকটাই তৈরি হয়েছে। আগে আমি বুঝতে পারিনি এই দেবালয়ের মাহাত্ম্য। কিন্তু এখন আমি বুঝতে শিখেছি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় কী জিনিস। আমার মনে হয়েছে, এই বিদ্যালয় এমন এক প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষার্থীকে শুধু ভালো রেজাল্টই দেয় না, দেয় মানুষ হবার, সুনাগরিক হবার শিক্ষা। যা অন্য বিদ্যালয় দিতে পারে না।

এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন কো-ক্যারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের সঙ্গে বিদ্যার্থীকে পরিচিত করে তোলা হয়। এখানকার অনুশাসন, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা একজন বিদ্যার্থীকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। আমার সবচাইতে ভালো লেগেছে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে 'দাদা ও ভাই'-এর সম্পর্ক। এই সম্পর্ক পড়াশোনার আগ্রহকে করে তুলেছে সহজ ও সরল। এই আবাসিক বিদ্যালয়কে আমরা সবাই নিজের পরিবারের মতো মনে করি। আমার মনে হয়, আমি নিজেই এখন এই দেবালয়ের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছি।

এই সম্পর্কের কথা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। কারণ এ শুধু অনুভব করা যায়। এখানে পাড়শোনার সুযোগ পেলেই বোঝা যাবে। ঠাকুর-মা স্বামীজীর আশীর্বাদে এই প্রতিষ্ঠান সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে।

'সবার মাঝে সদাই রাজে
প্রেমময় ঠাকুর,
আমাদের এই নরেন্দ্রপুর,
আমাদের বিদ্যার অঙ্গন।'

উদিত দত্ত, *অষ্টমশ্রেণী,*
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

জাতীয় উদ্যান

ভান্সদা

ভান্সদা জাতীয় উদ্যানটি গুজরাট রাজ্যের নবসারি জেলার ভান্সদা তহশিলে অম্বিকা নদীর তীরে অবস্থিত। এর আয়তন ২৪ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি। এই উদ্যানের উপরিভাগ ঘন ও লম্বা গাছের পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত। তারও উপরে রয়েছে বিভিন্ন লতা গুল্ম। এখানে ৪০০ রকমের ফুলগাছ রয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো অর্কিড। এই উদ্যানের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী ম্যাজেস্টিক ইন্ডিয়ান চিতাবাঘ। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে ঢোল, বন্য কুকুর, গাছে দুলতে থাকা রিসাস ম্যাকক ও বাঁদর, পাম সিভেট, বন্য শুয়োর, চার শিংওয়ালা হরিণ, হায়না, শজারু, বন বেড়াল, উড়ন্ত কাঠবেড়ালি উল্লেখযোগ্য। রয়েছে ১৫০ প্রজাতির পাখি।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭৫

৬১–৬১ একষষ্টিঃ, ৬২–৬২ দ্বিষষ্টিঃ।

৬৩–৬৩ ত্রিষষ্টিঃ, ৬৪–৬৪ চতুঃষষ্টিঃ

৬৫–৬৫পঞ্চষষ্টিঃ,৬৬–৬৬ ষট্ষষ্টিঃ,

৬৭– ৬৭সপ্তষষ্টিঃ,৬৮– ৬৮অষ্টষষ্টিঃ।

৬৯–৬৯ নবষষ্টিঃ,৭০–৭০ সপ্ততিঃ।

৭১–৭১একসপ্ততিঃ,৭২–৭২দ্বিসপ্ততিঃ,

৭৩–৭৩ ত্রিসপ্ততিঃ,৭৪–৭৪চতুঃসপ্ততিঃ।

৭৫–৭৫ পঞ্চসপ্ততিঃ,৭৬–৭৬ষট্সপ্ততিঃ।

৭৭– ৭৭ সপ্তসপ্ততিঃ,৭৮–৭৮অষ্টসপ্ততিঃ।

৭৯–৭৯নবসপ্ততিঃ,৮০– ৮০ অসীতিঃ।

ভালো কথা

টুনটুনির বাসা

আমাদের ছাদে আমার বাবা টবে বেগুন, করলা, শশা লাগিয়েছেন। প্রতি বছরই লাগান। তাতে অনেক বেগুন, করলা, শশা হয়। বাবা একদিন আমাকে বললেন, একটা জিনিস দেখবি আয়। আমি বাবার সঙ্গে ছাদে গিয়ে দেখি বড়ো বেগুনগাছটায় কাছাকাছি তিনটে বেগুনপাতা কী সুন্দর ভাবে সেলাই করে দুটো টুনটুনি বাসা করেছে। তিনটে লাল টুকটুকে ছানা হয়েছে। আমাকে দেখেই মা টুনটুনিটা বাসা থেকে উড়ে গিয়ে একটু দূরে বসল। বাবা বলল, তোকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমি তো যখন ওরা বাসা তৈরি করছিল তখন থেকে দেখছি। বাবা বলল কাউকে বলবি না। ছানাগুলো উড়তে শিখলেই ওরা চলে যাবে।

শিল্পা দত্ত, পঞ্চম শ্রেণী, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) খ সু অ খ সু

(২) সু সু গ ধা যো

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) রা র ধা বি ণী ব

(২) ম ক র ক রে হ

৭ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) অণুবীক্ষণ (২) অজ্ঞাতবাস

৭ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) অতিথিসৎকার (২) আত্মসম্মানজ্ঞান

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, ইবি, মালদা। (২) দীপমাল্য সিংহরায়, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০।
(৩) প্রীতিজা মাঝি, হৈবতপুর, মারিশদা, পূঃ মেদিনীপুর। (৪) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

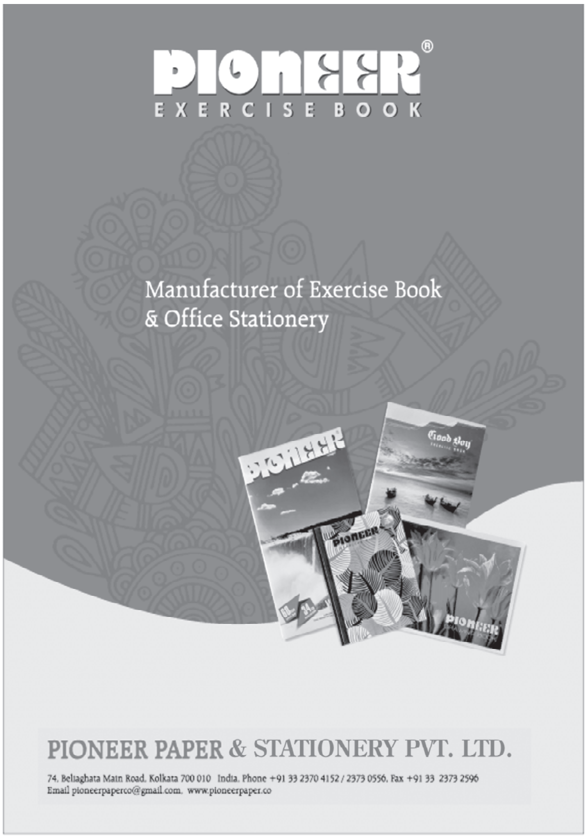

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বর্তমান ভারতবর্ষ : আদর্শ ও বাস্তব প্রেক্ষাপট

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০১ সালের ৬ জুলাই, এক বাঙ্গালি শিক্ষিত পরিবারে। তাঁর পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। এমন প্রজ্ঞাশীল পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠা শ্যামাপ্রসাদ খুব অল্প বয়সেই জ্ঞান, যুক্তি ও রাষ্ট্রচিন্তায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি কেবলমাত্র একজন অধ্যাপক নন, তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের ধারক। হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক মূল্যবোধের উপর ভরসা রেখে, ড. শ্যামাপ্রসাদ চেয়েছিলেন এক যুক্তিবাদী, সর্বপন্থ সমভাব অথচ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের জাতীয় চরিত্র কেবলমাত্র পশ্চিমি ভাবনার ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা যাবে না; এর জন্য প্রয়োজন ভারতের নিজস্ব সভ্যতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে, ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যখন ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঔপনিবেশিক প্রভাবের অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল এবং দেশীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রায় উপেক্ষিত ছিল। ড. মুখোপাধ্যায় এই ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমকে আধুনিকীকরণ করার পাশাপাশি ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গর্ব ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা করেন।

তাঁর অন্যতম বড়ো অবদান ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পাঠক্রমে ভারতীয় ভাষা ও শাস্ত্রীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্তি ও প্রসার। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শিক্ষার শিকড় জাতির সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক চেতনার মধ্যে নিহিত থাকা উচিত। ইংরেজি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত, বাংলা, ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির ওপরও সমান গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

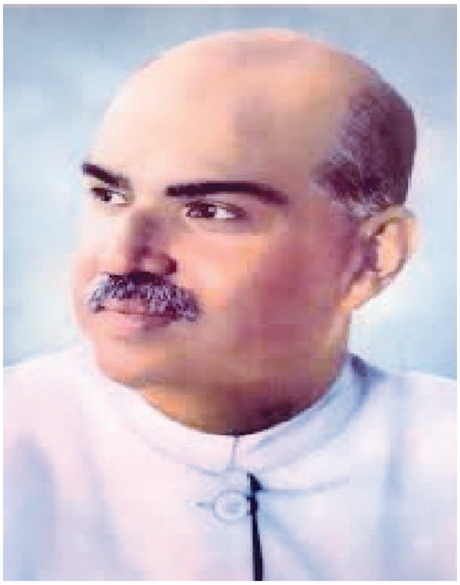

ড. শ্যামাপ্রসাদের ভাবনা যদি দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সর্বজনীন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে, তাহলে ভারতের উন্নয়ন আরও মানবিক, যুক্তিনিষ্ঠ ও স্থায়ী হতে পারে।

একই সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানের মূল্য অস্বীকার করেননি। বরং তিনি এমন একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা কল্পনা করেছিলেন, যেখানে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অগ্রগতিশীল চিন্তা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে মিশে যাবে। তাঁর মতে, এই সংমিশ্রণই এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারে, যারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধন রচনা করতে পারবে। ড. মুখোপাধ্যায় ছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসনের একজন দৃঢ় সমর্থক। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন এবং মনে করতেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা উচিত শিক্ষাবিদ ও বিদ্বজ্জনের মাধ্যমে; প্রশাসকদের মাধ্যমে নয়। তিনি যুক্তিসংগত বিতর্ক, বৌদ্ধিক স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করতেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল, শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধুই পেশাগত দক্ষতা নয়, বরং দায়িত্ববান, সচেতন ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা।

এই সংস্কার ও আদর্শের মাধ্যমে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এমন একটি শিক্ষা দর্শনের ভিত্তি গড়ে তোলেন, যা ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বিশ্বস্তরীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং ভারতীয় সভ্যতার মূল মূল্যবোধে গাঁথা। তাঁর এই শিক্ষাদর্শ আজও ভারতের শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

আদর্শগত দিক থেকে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের প্রবক্তা--- একটি এমন চিন্তাধারা যা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে জাতীয় জীবনের

ফঃ ৬

কেন্দ্রস্থলে স্থান দেয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ভারত কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক সত্তা নয়, বরং হাজার হাজার বছরের অব্যাহত সাংস্কৃতিক চেতনার ধারক ও বাহক একটি জীবন্ত সভ্যতা। তাই তাঁর জাতীয়তাবোধ ছিল রাজনৈতিক সীমানার উপর নয়, বরং ধর্ম (ধর্মনীতি), বহুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে ভর করা একটি সভ্যতাগত ঐক্যের দর্শনে তিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বাধীনতার দৃঢ় সমর্থক-- চিন্তা, মত প্রকাশ, ধর্মাচরণ ও রাজনৈতিক মতাদর্শে। তিনি কখনো কর্তৃত্ববোধে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে, গণতন্ত্র রক্ষা করা অপরিহার্য এবং সকল নাগরিকের উচিত পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে মত প্রকাশ এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকা।

যা তাঁর ভাবনা ছিল একটি শক্তিশালী ভারসাম্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করবে। তিনি অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ যেমন সমর্থন করতেন না, তেমনি বিভাজনমূলক আঞ্চলিকতাকেও বিপজ্জনক মনে করতেন। তাঁর মতে, জাতীয় উদ্দেশ্যের আলোকে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টনই ভারতের প্রকৃত শক্তির ভিত্তি।

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে তিনি গঠন করেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ যা আজকের ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি। এই রাজনৈতিক মঞ্চের মাধ্যমে তিনি ভারতের জন্য এক বিকল্প রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন-- যার ভিত্তি ছিল সাংস্কৃতিক গর্ব, জাতীয় অখণ্ডতা, আত্মনির্ভরতা এবং নৈতিক রাজনীতি। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল ভারতের একতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং নীতিনির্ধারণ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশীয় মূল্যবোধ পুনঃস্থাপন করা।

ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে ড. শ্যামাপ্রসাদের চিন্তা আজও বর্তমান ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাষ্ট্রচিন্তা, আজকের ভারতবর্ষের নীতিনির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন কঠিন এক সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, মুসলমানদের হিন্দুদের ওপর আক্রমণ-- এই সবকিছুর মাঝে তাঁর রাজনৈতিক অভিমুখ ছিল সুস্পষ্ট। ১৯৪০-এর দশকে তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। যদিও তিনি হিন্দু সংস্কৃতির পক্ষে দৃঢ় ছিলেন, কিন্তু তাঁর অবস্থান ছিল সকল রকম গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। তিনি বারবার বলেছিলেন-- 'আমি হিন্দু বলেই মানবতাবাদী'।

স্বাধীনতার আগে তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু নিধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। দেশভাগের সময়ে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার দেখে তিনি চুপ থাকেননি। তাঁর অন্যতম বড়ো রাজনৈতিক অবদান হলো পাকিস্তানের কবল থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে আনা। ১৯৪৭-এ পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হিন্দুদের পুনর্বাসন নিয়ে তিনি সোচ্চার হন। এই দৃষ্টান্ত আজও স্মরণীয়।

তিনি জম্মু-কাশ্মীরের জন্য পৃথক সংবিধান এবং ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিরোধিতা করে বলেছিলেন-- 'এক দেশ, এক পতাকা, এক সংবিধান।' এই আদর্শকেই পরবর্তীকালে বর্তমান ভারত সরকার বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৯ সালে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করে কেন্দ্র সরকার এক রাষ্ট্রনীতির পক্ষে শ্যামাপ্রসাদের ভাবনাকেই সম্মান জানিয়েছে।

ভারতবর্ষ আজ এক বিশাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। একদিকে অর্থনৈতিক বিকাশ, ডিজিটাল উন্নয়ন, জাতীয়তাবোধের উত্থান, অন্যদিকে অসাম্যের প্রাচীর, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও সামাজিক অসন্তোষ-- এই দুই বাস্তবতাই আজ ভারতের সামনে।

এই বাস্তবতার আলোকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ পুনরায় মূল্যায়নের প্রয়োজন :

১. ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন ভারত একটি সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র। আজকের ভারতে যেখানে জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত বিভাজনের আশঙ্কা মাঝে মাঝে মাথা তোলে, সেখানে শ্যামাপ্রসাদের মূলমন্ত্র-- 'একতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-- সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক।

২. তিনি সর্বপন্থ সমভাবের এমন এক রূপে বিশ্বাসী ছিলেন যা ধর্মকে অস্বীকার করে না, বরং সব ধর্মের সহাবস্থানে বিশ্বাস রাখে। তিনি ধর্মান্ধতার বিরোধিতা করলেও, ভারতের ঐতিহ্যগত ধর্মজ্ঞানকে সমাজগঠনের উপাদান মনে করতেন।

বর্তমান ভারতের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বার বার রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই খোলস থেকে সর্বপন্থ সমভাবের আদর্শকে উদ্ধার করতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এক বড়ো সহায়ক হতে পারে।

৩. যে দেশে শিক্ষানীতির সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ কমে যাচ্ছে, সেখানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা-দর্শন-জ্ঞান ও চরিত্রের সমন্বয়-- পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি রাখে। বর্তমান 'নতুন শিক্ষানীতি' অনেকাংশে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন বহন করে, তবে এর বাস্তবায়ন এখনো অসম্পূর্ণ।

৪. কাশ্মীর ইস্যু থেকে শুরু করে মুসলমান, অনুপ্রবেশ, সীমান্ত- রক্ষা-- এই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা ছিল দূরদর্শিতায় পূর্ণ। আজকের রাষ্ট্রনীতিতে এই চেতনার পরিরক্তা দৃশ্যমান। চীনের আগ্রাসন, বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যা, পাকিস্তান প্রসঙ্গে তাঁর নির্ভীক অবস্থান আজও প্রাসঙ্গিক।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তা কেবল একটি রাজনৈতিক মতবাদ নয়, এটি এক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। আজকের ভারতবর্ষ তাঁর স্বপ্নের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেলেও চূড়ান্ত রূপ পায়নি। তাঁর ভাবনা যদি দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সর্বজনীন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে, তাহলে ভারতের উন্নয়ন আরও মানবিক, যুক্তিনিষ্ঠ ও স্থায়ী হতে পারে।

দেশবাসী যদি বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে ড. শ্যামাপ্রসাদের আদর্শকে খুঁজে নিতে পারে, তাহলে আজকের ভারত আরও নৈতিক, সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ ও আত্মবিশ্বাসী এক জাতিতে পরিণত হবে।

'জীবনের ত্যাগ, চিন্তার গভীরতা এবং জাতির প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা-- এই তিনে গঠিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভারত চিন্তা। বর্তমান ভারত তাঁর ঋণ স্বীকার করুক শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, নীতিগতভাবে।'

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে সংবিধান-সহ সংস্কার কার্যক্রম শেষ হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত বছর (২০২৪) ৫ আগস্ট জেহাদি অভ্যুত্থানে আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর ড. ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের পুরোপুরি বাইরে রেখে সংবিধান-সহ নানা সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছে। সব রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের, যার সভাপতি হচ্ছেন ড. ইউনুস। কিন্তু প্রায় আড়াই কোটি জনগোষ্ঠীকে এই আলোচনায় সম্পৃক্ত করা হয়নি, তাদের মনোভাব জানতেও চাওয়া হয়নি। এ নিয়ে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও এর নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা।

ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে গত ১০ জুলাই আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই ক্ষোভের কথা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতার চিত্রও উপস্থাপিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আশা করেছিল যে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর গত পাঁচ দশক ধরে বিরাজিত ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর বৈষম্য ও নিপীড়ন চিহ্নিত করে তা অবসানের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপের সুপারিশ করার জন্য আলাদাভাবে একটি সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, কোনো আলাদা কমিশন গঠন করা হয়নি। পরবর্তীতে যে সব কমিশন গঠন করা হয়েছে সেখানেও ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি। এমনকী সংবিধান সংস্কার কমিশনেও কোনো সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নেই। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, দেশের সংস্কারের কথা বলা হলেও আলোচনার জন্যে কমিশনগুলো কোনো সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রায় এক ডজন সংস্কার কমিশন গঠন করে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও পেশ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয় যে, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কমিশনে বেশ কিছু লিখিত প্রস্তাবনা পাঠানোর পরও এ বিষয়সমূহ নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা মনে করেননি। এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্বের বিষয়টিকে কোনোরূপ বিবেচনায় না নিয়ে শাসন সংস্কারের কার্যক্রম এখন শেষ পর্যায়ে। রাজনৈতিক দলগুলোও ইতোমধ্যে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে যা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

> বিচারহীনতার সংস্কৃতি একদিকে সন্ত্রাসীদের ঘৃণ্য কাজ করতে উৎসাহিত করছে অপরদিকে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের মানবাধিকার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে এ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, এর মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর চলমান বৈষম্য ও নিপীড়ন দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে তা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতার চিত্র

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য

পরিষদ বলেছে, গত বছর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জেহাদি অভ্যুত্থানে আওয়ামি সরকারের পতন এবং শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ও জনজাতি সম্প্রদায়ের ওপর নতুন করে সাম্প্রদায়িক হামলা শুরু হয়। এ বর্বরতা এখনও অব্যাহত।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৪ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ১৪৯ দিনে মোট সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ২১৮৪টি। তৎপরবর্তীতে বর্তমান বছরের জানুয়ারি মাস থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ১৮১ দিনে মোট সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ২৫৮টি। অর্থাৎ ৪ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ৩৩০ দিনে মোট ২৪৪২টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

উপস্থাপিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত ২১ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ৫০ জন সংখ্যালঘু হত্যার শিকার হয়েছেন এবং ২৯ জন নারী বিশেষ করে কিশোরী ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। যেসব নারী ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন তাদের পরিবারের প্রায় সকলেই এখনও ভিটেমাটি ছাড়া। যা ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীষণ ভীতির সৃষ্টি করেছে এবং অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন কয়েকটি ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে যশোরের উপজেলার ডহর মশিহাটি গ্রামে ২০টি হিন্দু পরিবারের সর্বস্ব লুটপাটের পর বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করা, কুমিল্লার মুরাদনগরে হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করে তার ভিডিয়ো চিত্র সামাজিক মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া, ঢাকার খিলক্ষেতে বিনা নোটিশে সরকারি বুলডোজার দিয়ে প্রতিমা-সহ দুর্গামন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়া, লালমণিরহাটে সেলুন ব্যবসায়ী পরেশ চন্দ্র শীল ও ছেলে বিষ্ণু চন্দ্র শীলকে কথিত 'ধর্মঅবমাননা'র মিথ্যা অভিযোগ এনে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক ড. কুশল বরণ চক্রবর্তীকে উপাচার্য কার্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের সামনে মব সৃষ্টির মাধ্যমে হেনস্থা করে পদোন্নতি রুখে দেওয়া, সম্মিলিত হিন্দু জাগরণ জোটের মুখপাত্র সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর জামিন বাতিল করে আরও কয়েকটি ভিত্তিহীন মামলায় জড়িয়ে পুনরায় তাঁকে কারাগারে পাঠানো— এসব ঘটনা চরম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জ্বলন্ত উদাহরণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঐক্য পরিষদ বলেছে, সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে দৈহিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সারা দেশেব্যাপী চলমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ট্রমার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। গত ১৫ জানুয়ারি জনজাতি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষা ও জনজাতি হিসেবে তাদের পরিচয়ের দাবি-সহ নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক থেকে 'জনজাতি' শব্দযুক্ত জুলাই জেহাদি অভ্যুত্থানের চিত্রকর্ম বা গ্রাফিতি বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করতে গেলে উগ্র একটি গোষ্ঠী তাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। ঐক্য পরিষদ অভিযোগ করেছে, সরকারের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে রাজনৈতিক ট্যাগ দিয়ে অস্বীকার করা হয়, যার ফলে প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় না আনার কারণে সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। এ কারণে সংখ্যালঘুরা আরও হুমকির মুখে পড়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সম্পর্কিত ঘটনাবলীকে কোনোপ্রকার গুরুত্ব না দিয়ে ঐক্য পরিষদের উত্থাপিত প্রতিবেদন মিথ্যা, অতিরঞ্জিত ও বানোয়াট বলে অস্বীকার করার কৌশল নেওয়া হয়। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের ঐকান্তিক সহায়তায় দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম ওই রিপোর্টে উল্লেখিত সহিংসতার ঘটনার উপর বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করায় তা দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংস্থা, পার্লামেন্ট ও সরকার এবং জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাবলীকে বিভিন্নভাবে তুলে ধরার পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে এক প্রেস ব্রিফিঙে স্বীকার করেন যে বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং তা বন্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৮৮টি মামলায় ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আমরা বারবার বলে এসেছি যে, চলমান সহিংসতাকে যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন, ঐক্য পরিষদ ও ঐক্যমোর্চা মনে করে, গত ৪ আগস্ট থেকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে নিশানা করে তাদের বাড়িঘর, উপাসনালয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সকল হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ, হত্যা ও জোরপূর্বক নীরব চাঁদাবাজি-সহ যাবতীয় অপরাধের শিকার হিন্দু সমাজের নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনা শুধু ফৌজদারি অপরাধই নয়, এটি মানবতার বিরুদ্ধেও অপরাধ এবং তা এখনো চলমান রয়েছে।

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় নিয়ে এসে যাথাযথ বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্যোগে একেবারেই লক্ষণীয় নয়। এই পরিস্থিতি একদিকে সন্ত্রাসীদের এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ করতে উৎসাহিত করছে অপরদিকে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের মানবাধিকার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি ৪ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলীর সঙ্গে পরবর্তীতে সংঘটিত ২১ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত সহিংসতা বিশ্লেষণ করি তাহলে উপরোক্ত বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতার একটি আংশিক চিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি যার তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং আমাদের প্রতিনিধির কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্র কুমার নাথ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও। উপস্থিত ছিলেন অন্যতম সভাপতি অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ, জে এল ভৌমিক ও রঞ্জন কর্মকার, সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চাভুক্ত বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নির্বাহী মহাসচিব পলাশ কান্তি দে, ঋষি পঞ্চায়েত ফোরামের সভাপতি রামানন্দ দাস। □

বর্তমান ভারত এবং সাভারকর চর্চা

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনায়ক দামোদর সাভারকর। বীর সাভারকর। বর্তমান প্রজন্মের কাছে বোধ হয় এক বিস্মৃত চরিত্র। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র ভারতবর্ষের বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাসে সাভারকরের দু-তিন পঙ্ক্তির বেশি জায়গা হয়নি। গান্ধী, জওহরলাল থেকে এমএন রায়, মুজাফ্ফর আহমেদরা বরং কয়েক পাতাজুড়ে জাঁকিয়ে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট শাসনপর্বে ইতিহাস পাঠ্যতে সাভারকরকে দেশদ্রোহী রূপেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি পালটাচ্ছে। ভারতভূমে আজ রাষ্ট্রবোধ জাগরিত। ভারতে হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ ঘটেছে। এক্ষেত্রে সাভারকরের বলিদান, ত্যাগ, দেশাত্মবোধ বেশি মাত্রায় চর্চা হতে শুরু করেছে। সাভারকর নিছক এক হিন্দুত্ববাদী দেশ চিন্তকই নন। ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত ইসলামীয় এবং পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত এক সনাতন, শক্তিমান, আত্মনির্ভর ভারতরাষ্ট্র গঠনের প্রেক্ষাপট রচয়িতা। ভারতবর্ষে আজ যে হিন্দু জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে তার অন্যতম প্রবক্তা বীর সাভারকর। তাই আজকের প্রজন্মের কাছে বীর সাভারকারের জীবনীচর্চা অন্যতম কর্তব্য। তবে বর্তমানে এক্ষেত্রে সমাজমাধ্যম চলচ্চিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

প্রখ্যাত হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা রণদীপ হুড্ডা পরিচালিত 'স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর' চলচ্চিত্রটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয়। পরিচালক ও অভিনেতা রণদীপ হুড্ডা এক্ষেত্রে শুধু অভিনয়ের মাধ্যমে যে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তা নয় বরং সঠিক ইতিহাসের তিনি পুনর্নির্মাণ করেছেন। ১৯১১ থেকে ১৯২১ আন্দামানে কারারুদ্ধ জীবনযাপন, পরিশেষে ১৯২৪ মুক্তি। চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে মুক্তিকালে আপন দাদা ছাড়া তার পাশে কেউ নেই। সবদিক নিঃশব্দ, শূন্য। তিনি অভাজন। ইতিহাস তাঁর হাত ধরেও যেন ধরেনি। এটাই সাভারকরের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি। ইতিহাস কাউকে পরিসর দেয়, আবার কাউকে দেয় না। সাভারকরকেও দেয়নি। তিনি চর্চিত, নিন্দিত এবং ইতিহাসের এক অপ্রিয় সন্তানে পরিণত। সাভারকারের জীবন দর্শনকে সেকু-মাকু-বুদ্ধিজীবীরা কোনোদিনই গ্রহণ করতে পারেননি। তারা তাঁর সম্পর্কে জনমানসে ভ্রান্ত ধারণা প্রোথিত করেছেন। সেক্ষেত্রে সাভারকরের জীবন দর্শনের সঠিক মূল্যায়ন চলচ্চিত্রের মতো জনপ্রিয় মাধ্যমে জনমানসে তুলে ধরতে রণদীপ হুড্ডার প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়।

গান্ধীজী সাভারকরের যে বাক্‌যুদ্ধ হুড্ডা দেখিয়েছেন, তা চলচ্চিত্রের খাতিরে কল্পিত সংলাপ হলেও অবশ্যই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত। প্রেক্ষাপট কখনোই ভ্রান্ত নয়। গান্ধীজী-সাভারকরের হিংসা অহিংসার তত্ত্ব দিয়ে বিতণ্ডা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসলে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস এতকাল যেভাবে পড়ানো হয়েছে বা বোঝানো হয়েছে, আমরা সেটাই বুঝেছি বা মুখস্ত করেছি। পালটা প্রশ্ন করিনি বা করতে দেওয়া হয়নি। তবে যুগ পালটাচ্ছে। মানুষ জানতে, বুঝতে চাইছে। গান্ধীজীর ক্রোধ বর্জন আর অহিংসা নীতি সেকু-মাকুদের কাছে পরম গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল কিন্তু সাভারকর ক্রোধ বর্জন না করায় উপেক্ষিত হতে শুরু করেন। বা তাকে উপেক্ষা করা হয়। তবে সে ক্রোধ থেকে তার মনে জন্ম নেয় কঠোর ইতিহাসবোধ ও হিন্দুত্ব। তবে সেদিন থেকেই তিনি মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের কলমে ইতিহাসের পাতায় হয়ে ওঠেন কলঙ্কিত চরিত্র। বিতর্কিত প্রসঙ্গকেই সুন্দরভাবে চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন রণদীপ হুড্ডা। সাভারকরকে নিয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। তাইতো পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান মাত্র সাতদিনের জন্য ভারতে এলেও সে সময়ে সাভারকরকে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘ এক বছর কারাবাসে রাখা হয়। কী কারণে কারারুদ্ধ করা হয়, এর উত্তর নেহরু তথা কংগ্রেস নেতাদের কাছে ছিল না। বোধহয় সাভারকরের হিন্দুত্ব জাগরিত হলে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গদি নড়বড়ে হয়ে যেত। যোগ্য অথচ পরাজিত, মেধাবী কিন্তু ব্রাত্য এই ধরনের মানুষের ক্রোধ ছাড়া আর কিই-বা থাকতে পারে। সাভারকরেরও তাই ছিল। তবে তার রাষ্ট্রতত্ত্ব, হিন্দুত্ব বোধের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না।

এবার সময় এসেছে পাখি আওড়ানো ইতিহাস থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানের। প্রশ্ন করবার। যুক্তি খোঁজার। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র অবশ্যই বড়ো মাধ্যম। বড়ো হাতিয়ার। ধন্যবাদ রণদীপ হুড্ডা। সঠিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন অজানা তথ্য এই চলচ্চিত্রে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বর্তমান সময়ে সাভারকর চর্চা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি। হুড্ডা সেই কাজটাই করেছেন। আমরা তো শুধু ইতিহাসবিদদের আবেদন করব, নতুনভাবে প্রকৃত গবেষণার দ্বারা সাভারকরকে তুলে ধরা হোক। এটাই নবপ্রজন্মের কাছে আমাদের বার্তা। □

ভারতের মুসলমানদের উপর আরবীয় প্রভাব তাদের অনুন্নত রেখেছে

অমলেশ মিশ্র

কলকাতা-সহ ভারতের অন্যান্য শহরেও মুসলমান হোটেলে কোনো নিরামিষ খাদ্য পাওয়া যায় না। মাংসের কষা, কাবাব, চাপ, রেজালা, বিরিয়ানি ইত্যাদি সেখানে লভ্য। ভারতে শাকসবজির প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এখানকার মুসলমানদের মধ্যে মাংস খাবার এত প্রবণতা কেন?

আরব দেশের জমি বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার কারণে মরুভূমি। এই দুই ভৌগোলিক প্রতিবন্ধতার কারণে আরব সমাজ আজও পশুচারণের জীবিকায় পড়ে আছে— কৃষি ভিত্তিক সমাজে উন্নীত হতে পারেনি। তাই এখনও তারা চান্দ্রমাস অনুসরণ করে। কিন্তু কৃষি স্তরে উন্নীত হলে সৌর মাস ও সৌর বছর গণনা ব্যতীত কোনো উপায় থাকে না। সূর্যের বার্ষিক গতি ও ঋতু পরিবর্তনের উপর কৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল। বাদশা আকবর বিষয়টি বুঝে ছিলেন।

কৃষিই মানব সভ্যতার সূচনা করে। পশুপালন জীবনে স্থায়ী বাসস্থান ও অবসর পাওয়া সম্ভব হয় না। আরব সমাজ মূলত পশুপালক হওয়ার কারণে ইসলাম অভ্যুদয়ের আগে সেই দেশে কোনো সরকার, কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা, আইনকানুন কিছুই ছিল না বলা যায়। ইসলামের আবির্ভাবের (এখন থেকে মাত্র ১৪০০ বছর আগে) পরেই কোরান সমগ্র আরব জাতিকে একটি কেন্দ্রীয় সংবিধান উপহার দিল যাকে ভিত্তি করে আরব জাতি ইসলামি পতাকাতলে একত্রিত হলো। কিন্তু ভৌগোলিক কারণে আরব সমাজকে ইসলাম কোনো উন্নত সমাজ ছিল না। কোরান লুঠ এবং লুঠের মালকে বৈধ করল। নবি মহম্মদ নিজেই অনেকগুলি লুঠ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেদুইনরা কিন্তু আরব মরুভূমিতে টিকে থাকল— এই একবিংশ শতাব্দীতেও তারা ২ হাজার বছর আগেকার পরিস্থিতিতেই থাকল।

পরবর্তীকালে ইসলামি জগতে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হলো তখন মধ্যপ্রাচ্যের নদী তীরবর্তী কৃষিভিত্তিক সমাজের মানুষরাই অংশগ্রহণ করল, পশু পালনকারী আরব সমাজের কোনো অবদান থাকল না বললেই চলে। আরব্য জগতের শিক্ষা দীক্ষার মশালধারীদের মধ্যে বেশিরভাগই বিদেশি বিশেষ করে পারস্য-উদ্ভূত।

পশু হত্যা করে খাওয়া ব্যতীত আরব দুনিয়ায় আর কিছু সহজলভ্য ছিল না। তাই হত্যা ও নিষ্ঠুরতা মুসলমান সমাজে ডাল-ভাতের মতোই। আলবিরুনীর মতে, ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের মধ্যেকার লোভ, হিংসা, খুনোখুনি ও রক্তপাতকে অত্যন্ত হীন চোখে দেখত। তাই মুসলমানদের ম্লেচ্ছ, যবন বলত। অশিক্ষিত দরিদ্র হিন্দুরাও ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হওয়ার থেকে মৃত্যুবরণ শ্রেয় মনে করত। আর মুসলমানরা হিন্দুদের মুসলমান করার জন্য বলত— হয় ইসলামে এসো অন্যথায় মৃত্যুবরণ কর। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অতি সাধারণ মানুষদেরও এত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল যে ৭০০ বছরের মুসলমান শাসনে মাত্র ১১-১২ শতাংশ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিল।

ইসলামে অহিংসা ও নিরামিষ আহারের কোনো স্থান নাই। আরবে মূলত উটের মাংস খাওয়ার অভ্যাস ভারতে গোরু খাওয়ার রূপ নেয় যেহেতু ভারতের সর্বত্র উট পাওয়া যায় না। মেষ ও ছাগ মাংস চলতো পরে মুরগির মাংসও ভক্ষ বস্তু হলো।

ইসলামে নিষ্ঠুরতা ও রক্তপাত কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করতো না। খোদ নবি মহম্মদের যে চিত্র হাদিশে পাওয়া যায় তা ভারতীয় উপাসনা পদ্ধতির একজন প্রচারকেরও মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। তিনি এক নাগাড়ে ৬৩টি উট কোরবানি করেছিলেন। সারাদিন ধরে ৮০০ জনের শিরশ্ছেদ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। ২ জন উট চোর যখন ধরা পড়ল তখন লোহার শিক আগুনে লাল করে তাদের চোখে বিদ্ধ করা হলো। হাত-পা কেটে মরুভূমিতে ফেলে রাখা হলো। নিজের হাতে কোনো উপাসনা পদ্ধতির একজন প্রচারক এই সব নিষ্ঠুরতা যদি স্বাভাবিক ভাবে করতে পারেন তাহলে তার অনুগামীরাই বা কেন নিষ্ঠুর হবে না? এরকম কোনো প্রচারক ও প্রবক্তা অন্যান্য রিলিজিয়নেও পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্মে তো তা কল্পনায় আনা যায় না।

মুসলমান শাসনের যুগে বিশেষ করে মুঘল আমলে পারস্য থেকে অনেক মুসলমান স্থায়ীভাবে ভারতে চলে আসত। এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। প্রাচ্যের কৃষিভিত্তিক ইসলাম ও মধ্য প্রাচ্যের পশুচারণকারীদের মধ্যে নারী জাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য আছে। যদিও ইসলামে নারীর কোনো মর্যাদাই নেই। তারা শস্যক্ষেত্রের মতো। তবুও প্রাচ্যের মুসলমান মহিলারা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান মহিলার থেকে অনেকটা ভালো অবস্থায় আছেন।

মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার মতো অপরাধ করলে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে আলজিরিয়ায়। মিশরে মেয়েদেরও পুরুষদের মতো খত্না করানো হয়। রক্ত ক্ষরণের ফলে অনেক বালিকা প্রাণ হারায়। আফগানিস্তানের তালিবান সরকার মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ধ্বংসাত্মক, চূড়ান্ত রক্ষণশীল ও নিষ্ঠুর, আক্রমণাত্মক ইসলামকে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার কৃষি ভিত্তিক, গঠনমূলক ইসলাম ম্লান করে দিয়েছে। দেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সরকার ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান অনুসরণ করছে।

কোরানে কিছু আয়াত আছে যেগুলি মক্কায় নাজেল হয়েছে। সেগুলিকে মাক্কি আয়াত বলে। কিছু আয়াত মদিনায় নাজেল হয়েছে। সেগুলিকে বলে মাদানি। মাক্কি আয়তগুলির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করলে ইসলামকে এত ভয়াবহ মনে হবে না। কোরান শরিফের মাক্কি আয়াতগুলি শান্ত। কিন্তু হিজরতের পর নবি হয়ে গেলেন একাধারে মদিনার শাসক, প্রধান বিচারক ও প্রধান সেনাপতি। এখন থেকে শুরু হলো তরবারির সাহায্যে ইসলামের প্রসার। ৭নং সুরার ৯৪ নং আয়াতে বলা হলো— 'আমি কোনো জনপদে নবি পাঠালে সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি'। এরকম বহু আয়াৎই কোরাণে আছে যেগুলিকে 'জেহাদি' বলা যায়।

একজন হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হলে কী কী বিশেষ অধিকার অর্জন করে? ১. নিজের এক দুর্বোধ্য আরবি নাম রাখতে পারে। ২. কোনো নিকট আত্মীয়কেও বিবাহ করতে পারে— এক মায়ের দুধ খাওয়া মেয়েকে বাদ দিয়ে। ৩. এক সঙ্গে চারজন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারবে। তিনবার 'তালাক' উচ্চারণ করে স্ত্রী-কে বিতাড়ন করতে পারে। (সম্প্রতি এই ব্যবস্থাটি ভারতে রদ হয়েছে।) ৪. নারীকে পর্দাকৃত রেখে গৃহবন্দি ও নিরক্ষর রেখে একটি নিরক্ষর সমাজের শরিক হতে পারবে।

ভারতের ইসলামিরা আরবীয় প্রভাবে প্রভাবিত। তাদের উপর ভারতীয় প্রভাব অতি সামান্যই। বাংলাদেশের নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুস বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ আরবীয় প্রভাবিত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

দিল্লির একটি মুসলমান সংস্থা 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল'-এর একটি আলোচনাসভায় আলোচনার বিষয় ছিল—'Islamic Heritage : Indian Dimension'। ওই সভার প্রখ্যাত মুসলিম বিদ্বান, প্রাক্তন মন্ত্রী ও লেখক ড. রফিক জাকেরিয়া মুসলমান নেতৃত্বকে (ভারতের) সমালোচনা করে এসেছিলেন যে তারা ভারতের মুসলমানদের সমাজকে ভুলপথে চালাচ্ছেন, হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে শত্রুতা করে। ভারতের মুসলমানরা প্রধানত বস্তিবাসী। হিন্দু সমাজ থেকে ও হিন্দু সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলেই মুসলমান সমাজের এই দুর্গতি (ইংরেজি বক্তৃতাটির অনুবাদ)।

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী না প্রকৃত নাগরিক কাদের হাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ?

বিপ্লব বিকাশ

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, তাঁদের একজন ছিল মেজর (বরখাস্ত) আবদুল মজিদ। রাষ্ট্রপতিকে হত্যার পর পালিয়ে ভারতে প্রবেশ করে মজিদ। নিজের পরিচয় গোপন রেখে কলকাতায় 'বাঙ্গালি' সেজে জীবন কাটায় দীর্ঘ দুই দশক। বাংলাদেশের পুলিশ ২০২০ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ২০২০ সালের ১২ এপ্রিল। সে বৃহত্তর কলকাতা ও উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনা অঞ্চলে প্রায় ২২-২৩ বছর লুকিয়ে ছিল। ভাগে ভাগে একাধিক ভাড়াবাড়িতে অবস্থান করত এবং ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট ব্যবহার করতে।

এই ভাবেই লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, যেমন উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার ও কলকাতায়। এরা বাংলাভাষায় কথা বলে, বাঙ্গালি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। ফলে সহজেই স্থানীয়দের সঙ্গে মিশে যায় এবং রাজনৈতিক মদতে ভোটার তালিকায় নাম তুলে ফেলে। তাদের হাতে রয়েছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, সবই অবৈধভাবে প্রাপ্ত।

প্রশ্ন হলো, যারা নাগরিক নয় তারা ভোটার কী ভাবে হতে পারে? এরা কাদের ভোট দেয়? এর উত্তর খুব সহজ। যারা তাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করে, যারা রাজনৈতিক স্বার্থে এই অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেয়। এভাবে অনুপ্রবেশকারীরা শাসকদলের 'ভোটব্যাংক' হয়ে উঠেছে। যার ফলে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের ভোটাধিকার দুর্বল হয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা শুধু গণতন্ত্রের বিপর্যয় নয়, বরং একটি সুস্থ ও নিরাপদ সমাজব্যবস্থার জন্যও বড়ো বিপদ। এই অবস্থায় নির্বাচন কমিশনের উচিত, পশ্চিমবঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে Special Intensive Revision চালু করা।

বিহারে বর্তমানে এই প্রক্রিয়া সফলভাবে চলছে। যেখানে প্রতিটি ভোটারের পরিচয়পত্র ও নাগরিকত্ব যাচাই করা হচ্ছে। সুপ্রিমকোর্টও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, সংবিধানের ৩২৪ ও ৩২৬ ধারার অধীনে নির্বাচন করানো কমিশনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং অবৈধ ভোটার অপসারণের জন্য। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া পুরোপুরি সংবিধানসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত।

দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে— এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, এখানে ভুয়ো নথিপত্র তৈরির একটা সুসংগঠিত চক্র বহু বছর ধরে সক্রিয়, যারা লক্ষ লক্ষ জাল ভোটার কার্ড তৈরি করেছে এবং তাদের বৈধ ভারতীয় নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য হওয়া উচিত পশ্চিমবঙ্গেও Special Intensive Revision অবিলম্বে চালু করা। কারণ, শীঘ্র যদি এই প্রক্রিয়া শুরু না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যখন আদালতে বিষয়টি উঠবে, তখন কপিল সিব্বল বা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভিদের মতো আইনজীবীরা 'ভুল সময়ে' বা 'নির্বাচনের আগে এই প্রক্রিয়া চালানোর পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে'— এই যুক্তি তুলে ধরে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবেন। তাই কমিশনের উচিত এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া, যাতে সময়মতো কাজ শেষ হয় এবং নির্বাচন আসার আগেই সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও আস্থা তৈরি হয়।

পশ্চিমবঙ্গে আজ অনেক জায়গায় লোকজন প্রকাশ্যে বলছে, ১১টি জেলার নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণ করে মুসলমান ভোটাররা। এটা সর্বজনবিদিত যে, মুসলমান ভোট একতরফাভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে যায়। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস নিজের ভোটব্যাংক অটুট রাখতে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের 'বাংলাভাষী বাঙ্গালি' হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভারতীয় নাগরিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং সেই সঙ্গে সমাজে বিভেদ, অসহিষ্ণুতা ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রাখে। কিন্তু যদি একবার সাধারণ মানুষ নিশ্চিত হতে পারে যে, মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার থাকবে না, তাহলে তাঁরা নিজেরা নির্ভয়ে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তাঁদের আর আশঙ্কা থাকবে না যে ভোটদানের পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি সাহসী পদক্ষেপ তখন সত্যিই সম্ভব হবে।

তবে নির্বাচন কমিশনের কাজ এখানে খুব একটা সহজ হবে না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করবে না, একথা এখন পরিষ্কার। স্থানীয় প্রশাসনও রাজনৈতিক চাপে অনেক সময় নীরব থাকে বা বাধা সৃষ্টি করে। এই সরকারের 'নিরপেক্ষতা' কেবল কাগজে লেখা রয়েছে, বাস্তবে নয়। নির্বাচন কমিশনকে তাই এমনভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে প্রশাসনিক, আইনি ও সাংবিধানিক স্তরে তারা দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে। কারণ, এই সরকার নিজের 'ভোটব্যাংক' বাঁচানোর জন্য যেকোনো পদক্ষেপ নির্দ্বিধায় নিতে পারে। তাই এখন প্রশ্ন একটাই, নির্বাচন কমিশন কি সাহস দেখাবে? দেশের সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের দায়িত্ব কি তারা পালন করবে? সময় এসেছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

এই প্রক্রিয়া কার্যকর করতে সাধারণ নাগরিকের সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্দেহজনক কোনো নাম, ভয়ানক পরিচয়পত্র বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে এলাকাভিত্তিক নির্বাচন অফিসে অভিযোগ জানাতে হবে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যে এর প্রতিকার করতে হবে। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৩০)

হিন্দুত্ববোধ

নাগপুর থেকে পণ্ডিচেরী যাবার সময় একটা মজার কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল— কমপক্ষে ডাক্তারজীর কাছে তেমনটাই মনে হয়েছিল। ট্রেনে ডাঃ মুঞ্জে ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কামরায় আর ডাক্তারজী ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে। সে কারণে মাঝে মাঝে যখন স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতো ডাক্তারজী ডাঃ মুজের কাছে এসে খোঁজখবর নিয়ে যেতেন কিছু লাগবে কিনা। মাদ্রাস (বর্তমান চেন্নাই) পেরিয়ে যখন ট্রেন থামলো, তখন ডাঃ কেশবরাও ডাঃ মুজের কামরায় গেলেন তার বিছানা পত্র বাঁধাছাদার জন্য। কিন্তু এই কাজ করতে করতে হঠাৎ ট্রেন ছেড়ে দিল। কেশবরাও নামতে পারলেন না। ঠিক এই সময়ই টিকিট পরীক্ষক এসে হাজির । ডাঃ কেশবরাওয়ের কাছে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট দেখে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ওঠার জন্য জরিমানা ধার্য করে বসলেন, টাকা দিতে বললেন। কেশবরাও এবং শেষে ডাঃ মুঞ্জে পর্যন্ত তাকে বাস্তব অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন— বলা হলো পরে পরের স্টেশনে ট্রেন থামলেই কেশবরাও নেমে যাবে। কিন্তু টিকিট পরীক্ষকের উপর এসব কথার কোনো প্রভাব পড়ল না। সে তার নিয়মের অতিরিক্ত জরিমানার টাকা দাবি করতে থাকে।

এবার ডাঃ মুঞ্জে রেগে গেলেন। ধমক দিয়ে তাকে বললেন— 'যাও তোমাকে একটা পাই পয়সাও দেওয়া হবে না। মনে রেখ, তুমি চাকর আর আমরা তোমার মালিক।' বেচারা টিকিট পরীক্ষক একটু থতমত খেলো যেন, আসলে তাকে দেখে যাদের ভয় পাওয়ার কথা তারাই যেন ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু সেও দমবার পাত্র নয়, সেও বেশ স্বর উঁচিয়ে বলে উঠলো— 'আমার উপর মেজাজ দেখাবেন না, মনে রাখবেন, এটা মুসলমানদের দেশ নয়।' আসলে ডাঃ মুঞ্জের মাথায় উঁচু গোল টুপি, লম্বা দাড়ি, কেশহীন মণ্ডক দেখে টিকিট পরীক্ষক তাঁকে মুসলমান ভেবে বসেছিল। তার কথা শুনে তো দুই ডাক্তার মনে মনে হাসি চেপে রেখে মজা নিতে থাকলেন। আর তৃপ্তি লাভ করলেন এই ভেবে যে, সবাই ভাবে এই দেশে যারা বসবাস করে সবাই এদেশের মালিক, কিন্তু সঙ্ঘাতের সময় হিন্দু মনের দেশভক্তি কীভাবে জেগে ওঠে এটি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ইতিহাসের শাশ্বত সত্যের এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে ডাক্তারজী খুব আনন্দিত হলেন। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয়তা বিষয়ে আলোচনায় তিনি এই ঘটনাটি উল্লেখ করতেন।

(৩১)

গান্ধীজী সমীপে

গান্ধীজীর খিলাফত আন্দোলনের অতি উৎসাহের যোজনায় ডাক্তারজীর এবং তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের বা স্বাধীনতা সংগ্রামের সহযোগী বন্ধুদের কখনোই খুব একটা আগ্রহ ছিল না। ডাক্তারজী বলতেন— ভারতে মুসলমান ছাড়া খ্রিস্টান, পারসি, ইহুদি অনেকেই বাস করে। তাদের কথা উল্লেখ না করে শুধু মুসলমানদের কথা বলা হলে তারা নিজেদের আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভাববেন এবং একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ তাদের মনে জাগ্রত হবে। তবে অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীনতার লড়াইয়ে মানুষকে জাগ্রত করবে এ বিশ্বাস ডাক্তারজীর ছিল। দেশের কাজে সর্বদা নিজেকে সক্রিয় রাখাই ছিল তাঁর আগ্রহ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেভাবেই হোক লড়াইয়ের ভূমিকায় থাকাই ছিল তাঁর কাছে উচিত কর্তব্য। তাঁর আদর্শ ছিল 'কষ্টকে দোলনা বানিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করা'। সব ঠিক আছে, কিন্তু গান্ধীজীর ওই 'হিন্দু মুসলমান ঐক্যের' শব্দ প্রয়োগ ডাক্তারজীর ভালো লাগতো না। এ নিয়ে মনের সংঘাতকে আর জিইয়ে না রেখে তিনি একবার গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে সামনাসামনি এ বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন— 'হিন্দুস্থানে বসবাসকারী হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পারসি, ইহুদি ইত্যাদি সকলের ঐক্যের কথা না বলে আপনি শুধু হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা কেন বলেন?' গান্ধীজী উত্তর দেন— 'এর মাধ্যমে আমি মুলমানদের মনে আত্মীয়তার ভাব সৃষ্টি করছি। যার ফলে আপনি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে, তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে'।

এই উত্তর ডাক্তারজীকে খুশি করতে পারলো না। তিনি বললেন, 'হিন্দু মুসলমান একতা' শব্দ প্রয়োগের আগেই ব্যারিস্টার জিন্না, ডাঃ আনসারী, হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ মুসলমান তিলকের নেতৃত্বে দেশের প্রতি তাঁদের ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। আমার মনে হয় এই নতুন শব্দ প্রয়োগের ফলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব বৃদ্ধি পাবে। 'আমার সেরকম আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না'— এ কথা বলে গান্ধীজী ডাক্তারজীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ভবিতব্য এমনই যে ডাক্তারজীর কথাই একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হলো।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস